জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও কৃষি

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

Rjevq cwieZb, cwi‡ek I Kwl

মোঃ ইফতেখার আলী

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
SOUTH ASIA

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও কৃষি

মোঃ ইফতেখার আলী

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০১৮

প্রকাশনায়:
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাসা ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোনঃ (+৮৮০-২) ৯৮২০০৫১-২
Email: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়:
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং
ফ্রাঞ্জ-মেহ্রিং-প্লাটজ্ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.in
www.rosalux-southasia.org

মুদ্রণে:
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১৩

প্রচ্ছদ:
নূর উস সাফা অনিক
*প্লাস্টিক ভরা সাগরে ডুবে যাচ্ছে আমাদের পৃথিবী :
এই বাস্তবতা অবলম্বনে অঙ্কিত

Climate Change, Environment & Agriculture

Md. Iftekhar Ali

Published in: December, 2018

Published by:
Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 7 (Kajoli), Road 17, Block C
Banani, Dhaka- 1213, Bangladesh
Phone: (+880-2) 9820051-2
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

Supported by:
Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www.rosalux.in
www.rosalux-southasia.org

Printed by:
Dana Printers Limited
Ga-16 Mohakhali C/A, Dhaka-1213

Cover:
Noor Us Safa Anik
*Theme: Earth sinks in the sea
filled with plastics

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung e.V with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany

মুখবন্ধ

কৃষির সাথে পরিবেশ ও জলবায়ুর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। তাই জলবায়ু পরিবর্তন সারা পৃথিবীতেই কৃষির উপর প্রভাব ফেলছে। আর জলবায়ুর এই পরিবর্তনকে বুঝতে গেলে জলবায়ু, জলবায়ুর উপাদান, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, কারণ ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি জলবায়ু নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে কি রাজনীতি হচ্ছে তার খোঁজ-খবর রাখাও করণীয় নির্ধারণে সহায়ক হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি পৃথিবীব্যাপী ভয়াবহ মাত্রায় পরিবেশ দূষণ, অবক্ষয় এবং জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তির খবর পাওয়া যাচ্ছে।

এই শিক্ষামূলক পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছে বিষয়গুলো পরিচিত হলেও, যারা সে সুযোগ পাননি তাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের সমৃদ্ধির জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বই থেকে ভৌগলিক বিষয়াবলীর বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক রাজনীতি, পরিবেশ দূষণ, জীববৈচিত্র্য নাশ এবং এসবের সাথে কৃষি ও আমাদের জীবনের সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর সেকেন্ডারি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করেই মূলত পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

কৃষি নিয়ে রিইব-এর গত কয়েক বছরের কাজের প্রেক্ষিতে ধারাবাহিক আলোচনা ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কৃষি, পরিবেশ ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞবৃন্দ অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। এসব আলোচনা থেকে অর্জিত জ্ঞান এই পুস্তিকা প্রস্তুতিতে সবিশেষ সহায়তা করেছে। এছাড়া কৃষকদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং-এর সহায়তায় রিইব কর্তৃক প্রকাশিত এই পুস্তিকাটি কৃষক এবং কৃষি, পরিবেশ ও উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিবর্গের করণীয় নির্ধারণে সহায়তা করবে বলে আশা করি।

ড. শামসুল বারি
চেয়ারম্যান, রিইব।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: পৃথিবীর গঠন ও বাংলাদেশের ভূগোল	৫
অধ্যায় ২: জলবায়ু পরিবর্তন	২১
অধ্যায় ৩: জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক রাজনীতি	২৬
অধ্যায় ৪: বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পরিবেশ দূষণ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস	৩৪
অধ্যায় ৫: কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তন	৩৯
অধ্যায় ৬: করণীয়: ভবিষ্যত কৃষি ও জীবন?	৪১

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবীর গঠন ও বাংলাদেশের ভূগোল

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। এখানকার তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা প্রভৃতির বিভিন্নতার ভিত্তিতে বছরের বারো মাসকে ছয়টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছিল, যথা: গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ঋতুর নাম থেকেই আমরা কিছুটা ধারণা পাই যে সেসময় পরিবেশ কেমন থাকে। গ্রীষ্মকালে অনেক গরম পড়ে, বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়, আবার শীতের হিমশীতল বাতাস চারপাশ ঠান্ডা করে দেয়। এই বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন রকম অবস্থার সাথে এখানকার কৃষকরা অঞ্চল ও মৌসুমভিত্তিক ফসল আবাদের সময় ও পদ্ধতি ঠিক করেছিলেন। কিন্তু ইদানিং আমরা দেখতে পাই যে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির পরিমাণ ও ধরন আগের মত ঋতু অনুযায়ী থাকছে না। বছরের যে সময় আগে বৃষ্টি হত, এখন সেসময় হচ্ছে না। আবার আগে বছরের যে সময় বৃষ্টিই হত না, এখন সেসময় ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছে, এরকম নানা পরিবর্তন আমরা টের পাচ্ছি। প্রকৃতির এই পরিবর্তনকে এককথায় জলবায়ু পরিবর্তন বলা হয়। এই জলবায়ু পরিবর্তনকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য সামনের অংশে আমরা পৃথিবীর গঠন, বাংলাদেশের অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, জলবায়ু রাজনীতি, কৃষি এবং আমাদের কি করণীয় তা নিয়ে আলোচনা করব। এখানে পৃথিবী ও বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিষয়গুলির সংজ্ঞা ও তথ্য-উপাত্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ২০১৮ সালের নবম-দশম শ্রেণির “ভূগোল ও পরিবেশ” এবং “বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়” বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

মহাবিশ্ব ও পৃথিবী

আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠে বাস করি। দিনের বেলায় উপরের দিকে তাকালে আমরা নীল আকাশে সূর্য দেখতে পাই। এই সূর্য হল একটি নক্ষত্র, যা আসলে গ্যাস বা বাতাসের একটি পিন্ড। এই পিন্ডে হাইড্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস একসাথে থাকে। যে বল বা শক্তির সাহায্যে ঐ গ্যাসসমূহ একসাথে থাকে, ছড়িয়ে যায় না, তাকে মহাকর্ষ বলে। সূর্যে হাইড্রোজেন গ্যাস যখন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় তখন প্রচুর তাপ ও আলো সৃষ্টি হয় এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দিনের বেলা এই আলোতেই আমাদের চারপাশ আলোকিত থাকে। সূর্যের আলো ও বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে গাছ খাদ্য তৈরি করে ও বড় হয়, আর গাছের উপর নির্ভর করে প্রাণীরা বেঁচে আছে। অর্থাৎ উদ্ভিদ বা গাছ হল উৎপাদক, আর প্রাণীরা হল খাদক। সূর্য থেকে তাপ আসে বলে পৃথিবী খুব ঠান্ডা হয়ে যায় না। এভাবে সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে মানুষসহ অন্যান্য সকল জীবকে (উদ্ভিদ ও প্রাণী) বাঁচিয়ে রেখেছে। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়।

এই সূর্যকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে অনবরত ঘুরছে আটটি গ্রহ (চিত্র ১)। আমাদের বাসস্থান পৃথিবী ঐ আটটি গ্রহের একটি। সূর্য থেকে দূরত্ব অনুযায়ী গ্রহগুলোর নাম হচ্ছে: বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। পৃথিবী যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, তেমনি পৃথিবীকে কেন্দ্র

করে ঘুরছে চাঁদ। চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয়। এছাড়া মাঝে মাঝে আমরা আকাশে ধুমকেতু দেখতে পাই। সূর্য, একে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা গ্রহসমূহ, গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা উপগ্রহসমূহ, অসংখ্য ধুমকেতু, উল্কা ইত্যাদি ও বিস্তীর্ন ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগত গঠিত। এই সৌরজগতের যাবতীয় কাজ-কর্ম চলে সূর্যকে ভিত্তি করে। গ্রহ ও উপগ্রহের নিজস্ব আলো নেই।

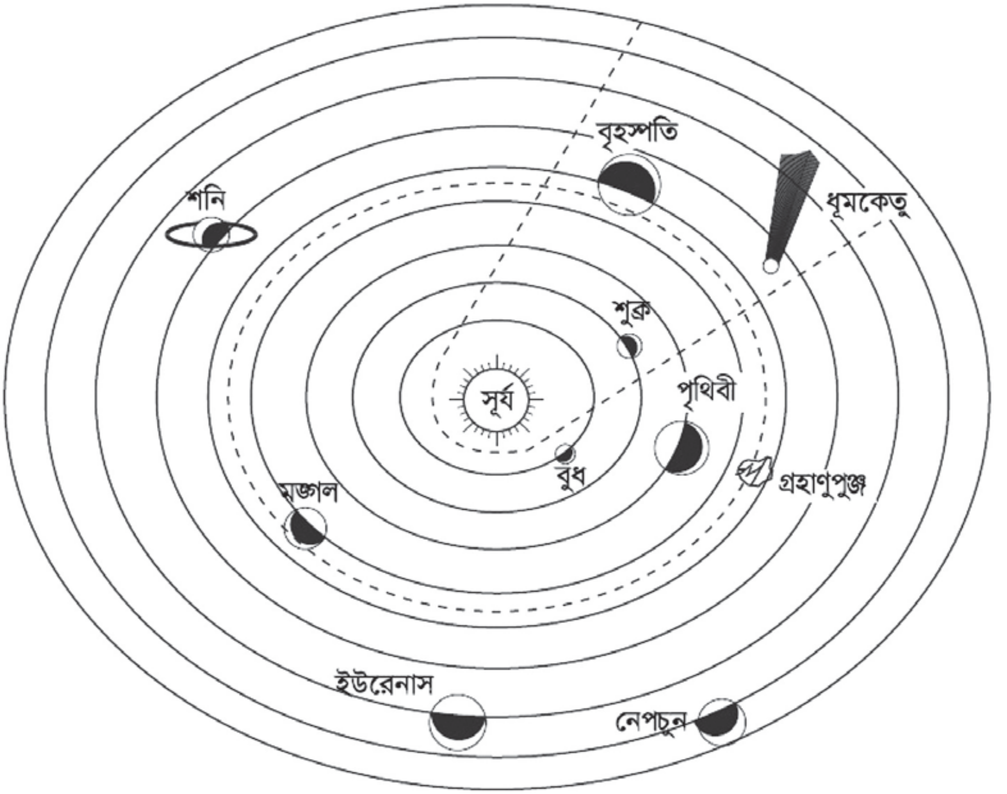

চিত্র ১: সৌরজগত এবং গ্রহগুলোর কক্ষপথ

(উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বই, পৃষ্ঠা ৪০)

আমাদের সৌরজগতের বেশির ভাগ জায়গায় ফাঁকা। এই সৌরজগত মিল্কিওয়ে নামক একটি গ্যালাক্সিতে অবস্থিত। মহাকাশে গ্রহ, নক্ষত্র, ধূলিকণা, ধুমকেতুর এক একটি বিশাল সমাবেশকে গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রজগত বলে। মহাবিশ্বে এরকম কত কোটি গ্যালাক্সি আছে তা এখনও আমাদের অজানা। আর রাতের বেলা মেঘমুক্ত আকাশে আমরা যে অজস্র তারা দেখতে পাই, সেগুলোর অধিকাংশই সূর্যের মতই এক একটি নক্ষত্র। যেসব জ্যোতিষ্কের নিজের আলো আছে তাদের নক্ষত্র বলা হয়। সূর্যের আলোর জন্য দিনের বেলায় নক্ষত্রগুলো দেখা না গেলেও, রাতে আমরা নক্ষত্রগুলোকে দেখতে পাই। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের এবং নক্ষত্রদের নিজেদের মধ্যে দূরত্ব এত বেশি যে কিলোমিটার দিয়ে এই দূরত্ব প্রকাশ করা মুশকিল, তাই এই দূরত্ব আলোক বর্ষ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে। এই বেগে আলো এক বছরে যত দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোক বর্ষ বলে। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র হচ্ছে সূর্য, আর সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে

সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড। আমাদের দ্বিতীয় নিকটতম নক্ষত্র হচ্ছে প্রক্সিমা সেন্টোরাই, পৃথিবী থেকে যার দূরত্ব প্রায় ৪.২ আলোক বর্ষ।

আমাদের পৃথিবী সূর্য থেকে এমন নিরাপদ দূরত্বে আছে যাতে এখানে মানুষ ও অন্যান্য জীব বেঁচে থাকতে পারে। সৌরজগতের যেসব গ্রহ সূর্যের আরও কাছে অবস্থিত, সেগুলোর তাপমাত্রা অনেক বেশি, আবার যেগুলো দূরে অবস্থিত সেগুলোতে তাপমাত্রা অনেক কম। তবে অবাক করা বিষয় হচ্ছে, সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধের চেয়ে দ্বিতীয় নিকটবর্তী গ্রহ শুক্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেশি। এর কারণ শুক্রের বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস অনেক বেশি পরিমাণে আছে, যা মেঘের মত শুক্রকে ঘিরে রাখে এবং গ্রিনহাউস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ শোষণ করে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় (চিত্র ২)। বদ্ধ কাঁচের ঘরে সূর্যের আলো ঢুকলে ভেতরটা গরম হয়ে যায়, আবার আবদ্ধ থাকার কারণে সেই তাপ আর বের হতে পারে না, ফলে বাইরের চেয়ে ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা বেশি হয়ে যায়, এভাবে গ্রিনহাউস প্রক্রিয়া কাজ করে। স্বচ্ছ পলিথিন বিছিয়ে রেখে এভাবে কৃষকরা বীজতলা শোধন করেন, কারণ আলোর সাথে তাপ পলিথিন ভেদ করে মাটিকে উত্তপ্ত করে, কিন্তু উপরে আবরণ থাকার কারণে মাটি তাপ ছাড়তে পারে না। শীতপ্রধান দেশে কাঁচের ঘরের ভেতরে এভাবে চাষাবাদ করা হয়। বদ্ধ কাঁচের ঘরের মত যেসব গ্যাস তাপ শোষণ করে ধরে রাখে সেগুলোকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলে। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডলেও যদি কার্বন ডাই অক্সাইড বা অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়, তাহলে গ্রিনহাউস প্রক্রিয়ায় গরম বেড়ে যাওয়ার ফলে আর জীবজগতের স্বাভাবিকভাবে বসবাসের উপযোগী থাকবে না।

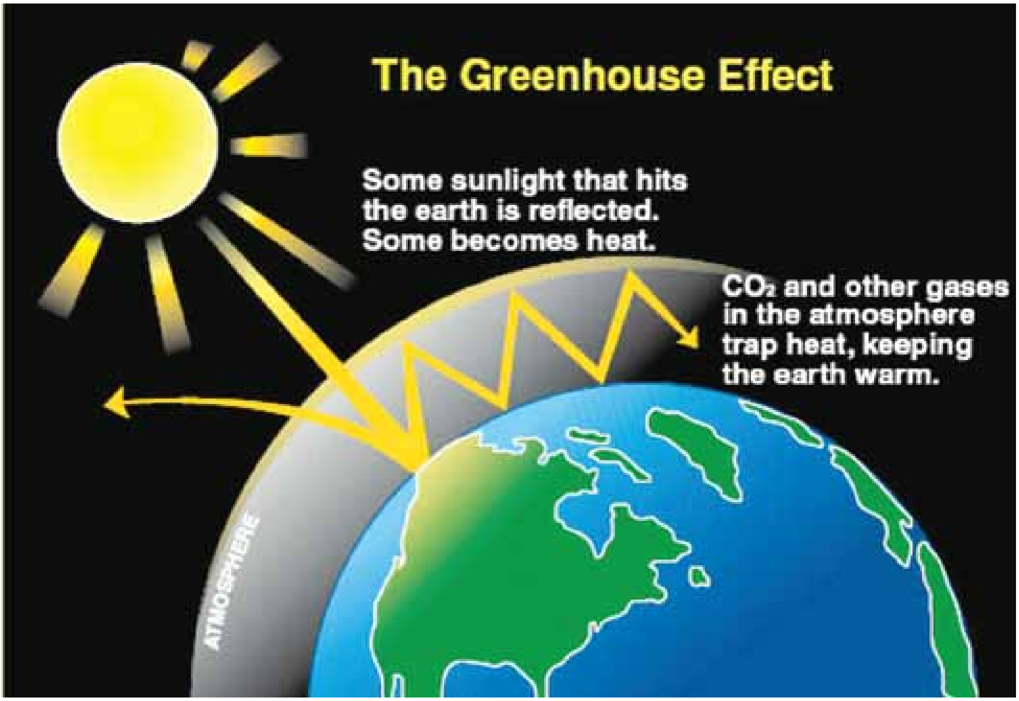

চিত্র ২ ঃ গ্রিনহাউস গ্যাস সূর্যের তাপ ধরে রাখে

উৎস ঃ http://astrocampschool.org/greenhouse-effect/

আমাদের পৃথিবীর আকৃতি ও গতি

আমাদের পৃথিবীর আকৃতি ফুটবলের মত গোলাকার, তবে উত্তর ও দক্ষিণে কিছুটা চাপা এবং পূর্ব ও পশ্চিমে কিছুটা স্ফীত (চিত্র ৩ক)। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের নিরক্ষীয় ব্যাসের চেয়ে উত্তর-দক্ষিণের মেরুদেশীয় ব্যাস ৪৩ কিলোমিটার ছোট। আমরা যদি পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম বরাবর একটি রেখা টানি, তাহলে সেটি পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করবে। এই কল্পিত রেখাকে নিরক্ষরেখা বলে, এখানে পৃথিবীর পরিধি সবচেয়ে বেশি। নিরক্ষরেখার উত্তর দিকের অর্ধেককে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ দিকের অর্ধেককে দক্ষিণ গোলার্ধ বলা হয় (চিত্র ৩খ)। অন্যদিকে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর কল্পিত রেখাকে অক্ষ বা মেরুরেখা বলে (চিত্র ৩গ)। এই রেখার উত্তর প্রান্ত বিন্দুকে উত্তর মেরু বা সুমেরু এবং দক্ষিণ প্রান্ত বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু বলা হয়।

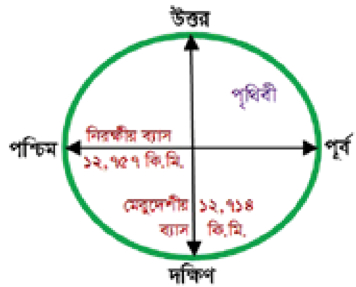

চিত্র ৩.ক: নিরক্ষীয় ও মেরুদেশীয় ব্যাস

চিত্র ৩.খ: নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ করেছে

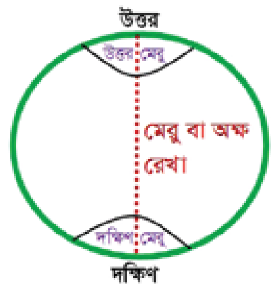

চিত্র ৩.গ: মেরু বা অক্ষরেখা

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কোন একটি স্থানকে নির্দিষ্ট করার জন্য বা ঐ স্থানের অবস্থান জানার জন্য পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ বরাবর কিছু রেখা কল্পনা করা হয়েছে, যেগুলোকে অক্ষাংশ বা অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমাংশ বা দ্রাঘিমা রেখা বলে (চিত্র ৪)।

আমরা আগেই জেনেছি যে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে অবিরত ঘুরছে। তবে পৃথিবী একটা নির্দিষ্ট পথ বা কক্ষপথে ঘোরে, অর্থাৎ পথের একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ঘোরা শুরু হলে আবার ঘুরতে ঘুরতে বারবার ঐ বিন্দু পেরিয়ে যায় (চিত্র ১)। আর নিজের পথে ঘোরার সময় লাটিমের মত নিজের অক্ষের উপরও ঘুরছে বা আবর্তন করছে।

পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে, নিজ অক্ষের উপর, একবার ঘুরতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড বা ২৪ ঘন্টা। একে সৌরদিন বলে, আর

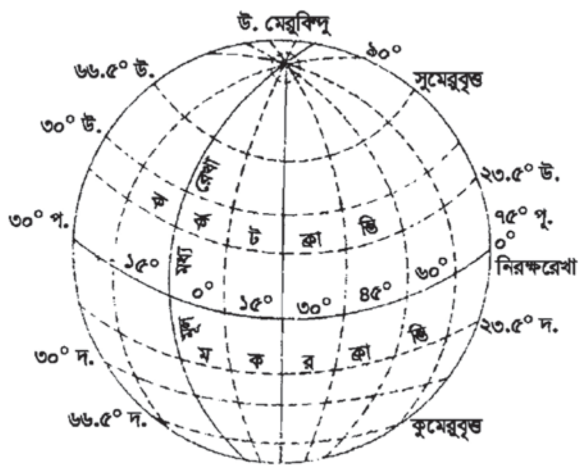

চিত্র ৪: অক্ষরেখা বা দ্রাঘিমারেখা
(উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নবম-দশম শ্রেণির ভূগোল ও পরিবেশ বই, পৃষ্ঠা ১৭)

পৃথিবীর এই গতিকে আহ্নিক গতি বলে। আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবীর যেদিকটা সূর্যের সামনে আসে সেখানে আলোকিত থাকে বা দিন হয়। আর পৃথিবীর আলোকিত স্থানের উল্টোপাশে যেখানে তখন সূর্যের আলো পৌছায় না, সেদিকটা অন্ধকার থাকে বা রাত হয়। নিজ অক্ষের উপর পর্যায়ক্রমিক ঘোরার কারণে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর আলোকিত দিকটি অন্ধকারে এবং অন্ধকার দিকটি আলোতে আসতে থাকে। আলোকিত স্থানগুলো অন্ধকার হয়ে যাওয়ার কারণে ঐসব স্থানে রাত এবং অন্ধকার স্থানগুলো আলোতে চলে আসার কারণে ঐ স্থানে দিন হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত হতে থাকে (চিত্র ৫)। এজন্য বাংলাদেশে যখন দিন, তখন ব্রাজিলে অন্ধকার রাত, কারণ পৃথিবীর গোলাকার আকৃতির জন্য বাংলাদেশ ব্রাজিলের প্রায় উল্টোপাশে অবস্থিত। অর্থাৎ একই সাথে পৃথিবীর কোন স্থানে সকাল, কোথাও দুপুর, আবার কোথাও রাত হয়, যা সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর ঐ স্থানের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। সময়ের হিসাব রাখার সুবিধার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের গ্রিনিচ মান মন্দিরের উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ মেরু বরাবর যে কল্পিত রেখা অতিক্রম করে তাকে মূল মধ্যরেখা বলা হয়ে থাকে। গ্রিনিচের পূর্ব দিকের দেশগুলো গ্রিনিচের সময়ের চেয়ে এগিয়ে এবং পশ্চিমের দেশগুলো গ্রিনিচের সময়ের চেয়ে পিছিয়ে থাকে। বাংলাদেশ গ্রিনিচ থেকে ৯০ ডিগ্রি পূর্বে অবস্থিত হওয়ায় গ্রিনিচের সময়ের চেয়ে ৬ ঘন্টা এগিয়ে থাকে। অর্থাৎ গ্রিনিচে যখন রাত ১২টা, তখন বাংলাদেশে সকাল ৬টা। এভাবে পূর্ব থেকে যত পশ্চিমে যাওয়া হয় ঘড়ির কাঁটা তত কমতে থাকে। পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির কারণে পর্যায়ক্রমে দিন-রাত্রি সংঘটিত হওয়া ছাড়াও জোয়ার-ভাটা, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত সৃষ্টি হয়। এছাড়া পৃথিবী এভাবে না ঘুরে শুধু একদিক সূর্যের দিকে থাকলে ঐদিক অনেক বেশি উত্তপ্ত ও উল্টোপাশ অনেক বেশি শীতল হয়ে যেত।

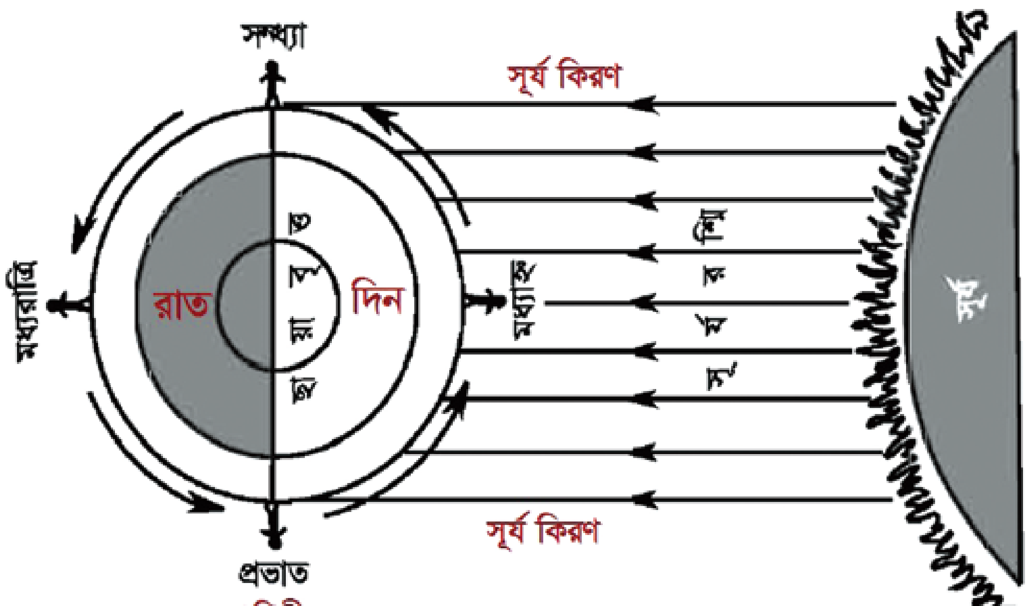

চিত্র ৫: পর্যায়ক্রমে দিন- রাত হচ্ছে

(উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নবম-দশম শ্রেণির ভূগোল ও পরিবেশ বই, পৃষ্ঠা ২৩)

আমরা জেনেছি যে পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর ঘুরতে ঘুরতে তার নিজস্ব পথ বা কক্ষপথে অবিরাম ঘুরছে। এভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজের কক্ষপথের পুরোটা একবার ঘুরতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। একে সৌরবছর বলা হয় এবং পৃথিবীর এই গতিকে বার্ষিক গতি বলে। হিসাবের সুবিধার জন্য আমরা ৩৬৫ দিনকে একবছর ধরি। আর অতিরিক্ত সময়ের সামঞ্জস্য আনার জন্য প্রতি চার বছর পর পর, ফেব্রুয়ারী মাসকে এক দিন বাড়িয়ে ২৯ দিন করা হয় এবং বছরের মোট দিনের সংখ্য ৩৬৬ দিন হয়, সে বছরকে অধিবর্ষ বা লিপ ইয়ার বলে। বার্ষিক গতির কারণে ঋতু পরিবর্তন ও দিনরাত্রির সময়ের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বার্ষিক গতির জন্য বছরের বিভিন্ন সময়ে রাতের আকাশে নক্ষত্র বা তারাগুলোর অবস্থানের পরিবর্তন দেখা যায়। তারাগুলো প্রতিদিন একটু করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরতে সরতে এক বছর পর পর আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসে।

ঋতু পরিবর্তন: তাপমাত্রার পার্থক্য অনুযায়ী সারা বছরকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: গ্রীষ্ম বা গরম কাল, শরৎকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল। অন্যদিকে পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: নিরক্ষরেখার উত্তরে উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণে দক্ষিণ গোলার্ধ। উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল তখন দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল হয়। আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। কেন এরকম হয় তার প্রধান কারণ এখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হল।

সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী যখন নিজ কক্ষপথে ঘোরে তখন কিছুটা হেলে থাকে। কারণ উত্তর-দক্ষিণ যে মেরুরেখা আছে সেটি কক্ষপথের সাথে সমকোণে না থেকে প্রায় ৬৬.৫ ডিগ্রি কোণে হেলে আছে। পৃথিবীর এরকম অবস্থানের কারণে ২১ মার্চ সূর্য মাঝ বরাবর বা নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এরপর ধীরে ধীরে সূর্য কিরণ উত্তর গোলার্ধের দিকে যেতে থাকে এবং ২১ জুন পৃথিবী এমন জায়গায় আসে যে তখন উত্তর গোলার্ধের ২৩.৫ ডিগ্রি অক্ষাংশে বা কর্কটক্রান্তি রেখার উপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। তখন উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ সবচেয়ে দূরে থাকে। তাই সেসময় উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রা বেশি থাকার কারণে গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রা কম থাকার কারণে শীতকাল থাকে। ফলে ২১ জুন উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন ও ছোট রাত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট দিন ও বড় রাত হয়। ২১ জুনের পর থেকে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে সরতে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ কাছে আসতে থাকে। ২৩ সেপ্টেম্বর সূর্য কিরণ আবার পৃথিবীর মাঝ বরাবর নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে পড়ে এবং সব জায়গায় দিন রাত্রি সমান হয়। আর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের কাছে আসতে আসতে ২২ ডিসেম্বর পৃথিবী এমন অবস্থানে আসে যে দক্ষিণ গোলার্ধের ২৩.৫ ডিগ্রি অক্ষাংশে বা মকরক্রান্তি রেখার উপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে ঐদিন দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন এবং উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট দিন হয়। দিনের দৈর্ঘ্য বড় ও তাপমাত্রা বেশি থাকার কারণে সেসময় দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং দিনের দৈর্ঘ্য ছোট ও তাপমাত্রা কম থাকার কারণে উত্তর গোলার্ধে শীতকাল থাকে। ২২ ডিসেম্বরের পর আবার উত্তর গোলার্ধ সূর্যের কাছে আসতে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ দূরে সরতে থাকে। পরবর্তিতে ২১ মার্চ নিরক্ষরেখার উপর ও ২১ জুন উত্তর গোলার্ধে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দিতে থাকে। এভাবেই একবার উত্তর গোলার্ধ সূর্যের কাছে আসে এবং একবার দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের কাছে আসে। আর পর্যায়ক্রমে তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে আমাদের ঋতু পরিবর্তন হতে থাকে (চিত্র ৬)।

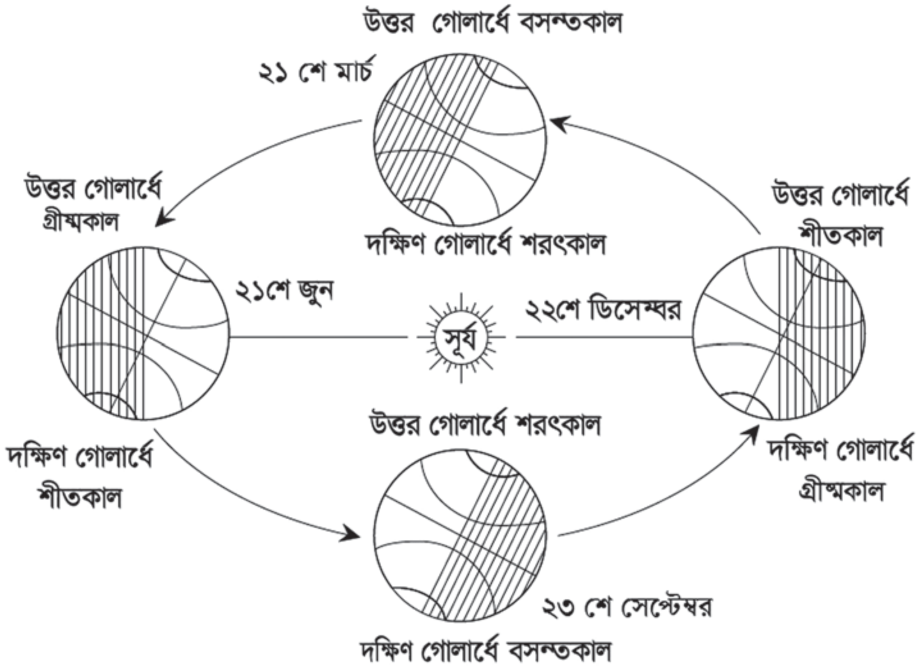

চিত্র ৬: পৃথিবীর পরিক্রমণের কারণে ঋতু পরিবর্তন
(উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বই, পৃষ্ঠা ৫১)

উপরের তারিখগুলো বোঝার সুবিধার জন্য নিচে আরেকবার দেওয়া হল:

২১ মার্চ: সূর্য পৃথিবীর মাঝ বরাবর নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। এসময় উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল। এরপর থেকে উত্তর গোলার্ধ সূর্যের কাছে আসতে থাকে।

২১ জুন: এদিন উত্তর গোলার্ধ সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি চলে আসে। তাই সূর্য উত্তর গোলার্ধে লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং সেখানে গরমকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল। এরপর থেকে উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে সরতে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ কাছে আসতে থাকে। উত্তর গোলার্ধের যে স্থান পর্যন্ত সূর্য কিরণ লম্বভাবে পড়ে তাকে কর্কটক্রান্তি রেখা বলে।

২৩ সেপ্টেম্বর: সূর্য আবার পৃথিবীর মাঝ বরার নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। এসময় দক্ষিণ গোলার্ধ ক্রমে সূর্যের কাছে আসছে এবং উত্তর গোলার্ধ দূরে সরে যাচ্ছে। এসময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল।

২২ ডিসেম্বর: সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং এসময় সেখানে গরমকাল। উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে থাকার কারণে সেখানে শীতকাল। এরপর আবার দক্ষিণ গোলার্ধ দূরে সরতে থাকে এবং উত্তর গোলার্ধ কাছে আসতে থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধের যে স্থান পর্যন্ত সূর্য কিরণ লম্বভাবে পড়ে তাকে মকরক্রান্তি রেখা বলে।

বাংলাদেশের অবস্থান উত্তর গোলার্ধে হওয়ায় এখানে মার্চে বসন্তকাল, জুনে গরমকাল, সেপ্টেম্বরে শরৎকাল এবং ডিসেম্বর মাসে শীতকাল হয়। উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে দক্ষিণ গোলার্ধের মকরক্রান্তি রেখা পর্যন্ত অংশে বছরের বিভিন্ন সময় সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি রেখার আরও উত্তরে বা মকরক্রান্তি রেখার আরও দক্ষিণে সূর্য কিরণ তীর্যকভাবে পড়ে, ফলে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। আর একেবারে উত্তর বা দক্ষিণ প্রান্তে সূর্য কিরণ একেবারে কম পৌছানোর কারণে তাপমাত্রা অনেক কম থাকে। এজন্য সেখানে বরফ জমে থাকে।

উপরের আলোচনার সারমর্ম হল, পৃথিবী লাটিমের মত নিজ অক্ষের উপর ঘুরতে ঘুরতে নিজের কক্ষপথে অবিরাম ঘুরছে। নিজ অক্ষের উপর একবার ঘুরতে পৃথিবীর প্রায় ২৪ ঘন্টা বা একদিন লাগে এবং ঘোরার সময় যে পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের দিকে থাকে সেখানে দিন ও উল্টোপাশে রাত হয়। অন্যদিকে নিজের কক্ষপথে একবার ঘুরতে পৃথিবীর প্রায় ৩৬৫ দিন বা এক বছর লাগে। নিজের কক্ষপথে ঘোরার সময় পর্যায়ক্রমিকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের কাছে আসে ফলে ঋতু পরিবর্তন হয়।

আমাদের পৃথিবীর গঠন

ধারণা করা হয় যে লক্ষ লক্ষ বছর আগে যখন সূর্য সৃষ্টি হয়, তখন তার অবশিষ্ট অংশ মহাকাশে ধূলিকণার মত ভেসে বেড়াত। এই ধূলিকণাগুলো একত্রিত হয়ে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। শুরুর দিকে পৃথিবী এত গরম ছিল যে পৃথিবীপৃষ্ঠ টগবগ করে ফুটতো। তারপর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়েছে। ঠান্ডা হওয়ার সময় ভারী পদার্থগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলে গেছে আর হালকা পদার্থগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে থেকে গেছে। তাই সবচেয়ে হালকা পদার্থগুলো বায়ুমন্ডল, তুলনামূলক ভারী অংশগুলো ভূ-পৃষ্ঠ এবং সবচেয়ে ভারী পদার্থগুলো পৃথিবীর ভেতরের অংশ গঠন করেছে। পৃথিবীর গঠন বোঝার জন্য এই তিনটি অংশ নিয়ে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১) পৃথিবীর পৃষ্ঠকে যে বায়বীয় অংশটি ঘিরে রেখেছে, অর্থাৎ যেখানে আমরা নিঃশ্বাস নেই বা মেঘ ভেসে বেড়ায়, সেটি হচ্ছে বায়ুমন্ডল। হালকা বা বায়বীয় পদার্থগুলো একত্রিত হয়ে পৃথিবীর বাইরের দিকের এই অংশ তৈরি করেছে। বায়ুমন্ডল মূলত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস নিয়ে গঠিত। এছাড়াও জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং আরও কিছু গ্যাস বায়ুমন্ডলে আছে। তবে বায়ুমন্ডলের উপাদানের প্রায় ৭৮% নাইট্রোজেন ও ২০.৭১% অক্সিজেন গ্যাস, আর অন্যান্য সকল উপাদান মাত্র ১.২৭%।

আমরা দেখতে পাই পৃথিবী সবকিছুকে তার নিজের দিকে বা মাটির দিকে টানে, যে কারণে কোন কিছু ফেলে দিলে মাটিতে বা নিচে গিয়ে পড়ে। পৃথিবীর এই টানকে অভিকর্ষ বা মধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে। এই টানের ফলে বায়ুমন্ডলের গ্যাসগুলো পৃথিবীর কাছাকাছি থাকে এবং পৃথিবীর সাথে ঘুরতে থাকে। বায়ুমন্ডলের গভীরতা প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার। তবে বায়ুমন্ডলের ৯৭ ভাগ উপাদানই প্রায় ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমুদ্র সমতলের ভূ-পৃষ্ঠে এর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং ওপরের দিকে ঘনত্ব খুবই কম।

বায়ুমন্ডল যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তাদের বৈশিষ্ট্যের (তাপমাত্রা, চাপ, ঘনত্ব) ভিত্তিতে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে একে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ট্রপোমন্ডল, স্ট্রাটোমন্ডল, মেসোমন্ডল ও তাপমন্ডল (চিত্র ৭)।

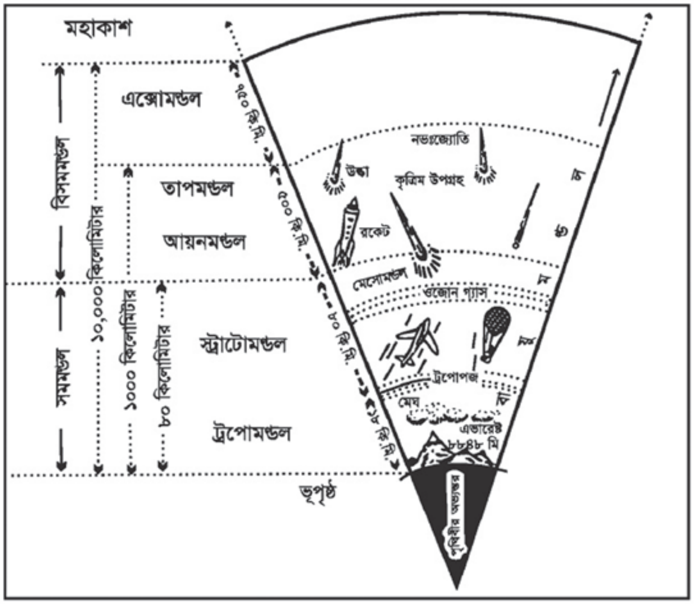

চিত্র ৭: বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তর

(উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নবম-দশম শ্রেণির ভূগোল ও পরিবেশ বই, পৃষ্ঠা ৭১)

ট্রপোমন্ডল: এটি বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর এবং ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লেগে আছে। এ স্তরের গভীরতা স্থানভেদে ৮ থেকে ১৯ কিলোমিটার। আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত যাবতীয় প্রক্রিয়ার বেশিরভাগ -যেমন ঝড়, তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা প্রভৃতি- এ স্তরে ঘটে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে যাওয়া হয় বাতাসের ঘনত্ব ও তাপমাত্রা তত কমতে থাকে এবং বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমতে থাকায় আমরা পর্বত চূড়ায় বরফ জমতে দেখি। সাধারণভাবে প্রতি ১ কিলোমিটার উপরে গেলে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমে। ট্রপোমন্ডলের উপরের অংশে তাপমাত্রা -৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে হতে পারে। এ স্তরের নিচের দিকের বাতাসে জলীয় বাস্প বেশি থাকে।

স্ট্রাটোমন্ডল: এটি বায়ুমন্ডলের পরবর্তী স্তর যা ওপরের দিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। ওজন গ্যাসের বেশিরভাগ এ স্তরেই আছে। এ ওজন স্তর সূর্যের আলোর বেশিরভাগ অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নিয়ে পৃথিবীকে জীবজগতের বসবাসযোগ্য রাখে। এ স্তরে বায়ুর ঘনত্ব ও চাপ উভয়ই অনেক কম। তবে এ স্তরের ২০ কিলোমিটার থেকে ধীরে ধীরে বায়ুর তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। এখানে জলীয় বাস্প নেই।

মেসোমন্ডল: স্ট্রাটোমন্ডলের ওপরের স্তর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত আবার তাপমাত্রা দ্রুত কমতে থাকে, যাকে মেসোমন্ডল বলে। এখানে তাপমাত্রা কমতে কমতে -৮৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যায়। তবে ৮০ কিলোমিটারের পর আবার তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া থেমে যায়।

তাপমন্ডল: মেসোমন্ডলের ওপরের প্রায় ৫০০ কিলোমিটার অংশকে তাপমন্ডল বলে। এখানে আবার তাপমাত্রা দ্রুত হারে বেড়ে প্রায় ১,৪৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়।

এক্সোমন্ডল: তাপমন্ডলের উপরে প্রায় ৯৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুর স্তরকে এক্সোমন্ডল বলে। এখানে তাপমাত্রা ৩০০- ১,৬৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। এ স্তরে খুব সামান্য পরিমাণ গ্যাস থাকে, কেননা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি কম থাকায় গ্যাসের কণাগুলো সহজেই মহাকাশে ছড়িয়ে যায়।

বায়ুমন্ডলে এরকম বিভিন্ন স্তর না থাকলে পৃথিবীর উপরিভাগ চাঁদের মত মরুময় হতো, ফলে কোন জীবের অস্তিত্ব থাকত না।

২) কিছুটা ভারী পদার্থগুলো তৈরি করেছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ। পৃথিবীর পৃষ্ঠ মাটি বা পানি দ্বারা আবৃত।

৩) সবচেয়ে ভারী পদার্থগুলো মিলে তৈরি হয়েছে পৃথিবীর ভেতরের অংশ।

পৃথিবীর ভেতরের অংশ ও ভূ-পৃষ্ঠ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে আরও বিশদ আলোচনা করব।

পৃথিবীর অভ্যন্তরিন গঠন

পৃথিবী প্রায় একটি গোলকের মত, যার ব্যাসার্ধ আনুমানিক ৬,৪০০ কিলোমিটার। আর পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে এর কেন্দ্র পর্যন্ত ৩ টি স্তরে ভাগ করা হয়। এগুলো হল: ভূত্বক বা অশ্মমন্ডল, গুরুমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডল (চিত্র ৮)।

১. ভূত্বক: পৃথিবী পৃষ্ঠের বাইরের আবরণ, যেখানে আমরা চলাফেরা করি, তাই ভূত্বক। সাধারণত পাথর, নুড়ি, কাঁকড়, বালি, কাদা দ্বারা ভূত্বক গঠিত। এদের সাথে মিশে থাকে মৃত গাছ ও প্রাণীর দেহের অংশ বা জৈব পদার্থ। ভূত্বক গঠনকারী এসকল কঠিন পদার্থকে এক কথায় শিলা বলা হয়। অন্যদিকে শিলাকে আবার বিভিন্ন খনিজের মিশ্রণও বলা যায়। খনিজ হল প্রাকৃতিক অজৈব পদার্থ যা এক বা একাধিক মৌলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন: হীরা, সোনা, তামা, রূপা, পারদ, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, লোহা, তেল, কয়লা ইত্যাদি।

মাটি: কঠিন শিলা থেকে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নরম মাটি তৈরি হয়। কঠিন শিলা থেকে সাধারণত দুটি পর্যায়ে নরম মাটি তৈরি হয়:

প্রথমত, কঠিন শিলা দীর্ঘদিন ধরে রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, ভূমিকম্প প্রভৃতির কারণে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়। আর বাতাস, বরফ বা পানির প্রবাহ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্ষুদ্র শিলাকণা এসে একটি স্থানে জমা হয়।

দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র শিলাকণার সাথে পানি, বাতাস, ব্যাকটেরিয়া, অনুজীব, পচা ও মৃত জীবের দেহাবশেষ যোগ হয়।

আমরা যে মাটি দেখতে পাই তা এভাবেই কঠিন শিলা থেকে তৈরি হয়েছে। নদীবিধৌত বাংলাদেশের অনেক স্থানের মাটির উপরিভাগ পলিমাটি দ্বারা গঠিত, যা ফসল চাষের জন্য খুব উপযোগী। এই পলি নদীর পানির সাথে ভেসে এসে এখানে জমা হয়েছে।

ভূত্বকের পুরুত্ব গড়ে ২০ কিলোমিটার। তবে স্থানভেদে ভূত্বকে পুরুত্ব ভিন্ন হয়। যেমন মহাদেশের তলদেশে গড়ে ৩৫ কিলোমিটার, আবার সমুদ্র তলদেশে গড়ে মাত্র ৫ কিলোমিটার পুরু। ভূত্বকের নিচের দিকে নামতে থাকলে প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ে।

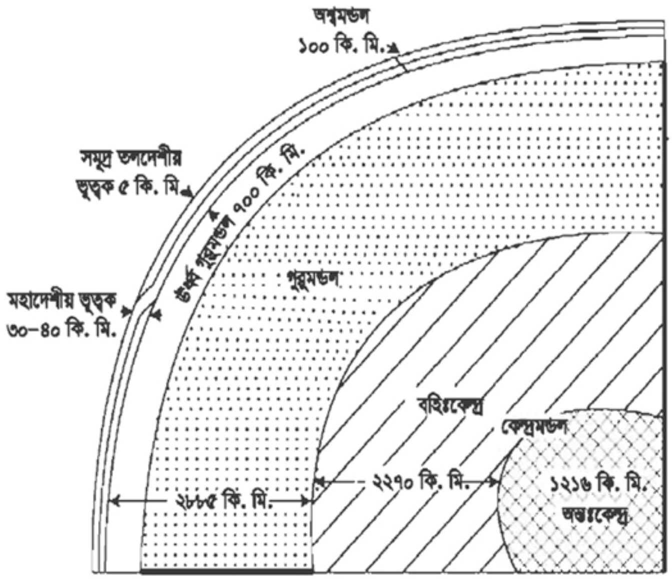

চিত্র ৮: পৃথিবীর ভেতরের অংশের বিভিন্ন স্তর

(উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নবম-দশম শ্রেণির ভূগোল ও পরিবেশ বই, পৃষ্ঠা ৪৮)

২. গুরুমন্ডল: ভূত্বকের নিচের স্তরই গুরুমন্ডল, যা প্রায় ২,৮৮৫ কিলোমিটার পুরু। এর উপরের দিকের ১০০ কিলোমিটারের শিলা কঠিন ও ভঙ্গুর এবং শিলামন্ডল নামে পরিচিত। উপরের এই কঠিন অংশের নিচের শিলা গলনাঙ্কের কাছাকাছি হওয়ায় আংশিক নরম অবস্থায় আছে, যা প্রায় ৭০০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উপরের অংশ প্রধাণত লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ সিলিকেট খনিজ দ্বারা গঠিত। এছাড়া অনুমান করা হয় যে গুরুমন্ডলের নিম্নভাগ (৭০০- ২,৮৮৫ কিলোমিটার) আয়রন অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এবং সিলিকন ডাইঅক্সাইড খনিজ দ্বারা গঠিত। গুরুমন্ডলের ১০০ কিলোমিটার গভীরতায় আনুমানিক তাপমাত্রা ১,১০০ থেকে ১,২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ৭০০ কিলোমিটার গভীরতায় প্রায় ১,৯০০ ডিগ্রি এবং একবারে নিচে প্রায় ৩,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

৩. কেন্দ্রমন্ডল: গুরুমন্ডলের নিম্নভাগ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে কেন্দ্রমন্ডল বলে। এ স্তর প্রায় ৩,৪৮৬ কিলোমিটার পুরু এবং তাপমাত্রা প্রায় ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এখানকার প্রধান দুইটি উপাদান হচ্ছে লোহা ও নিকেল।

পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন

ভূপৃষ্ঠ সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও উঁচু পর্বত, কোথাও ঢাল, আবার কোথাও সমতল। ভূমিরূপকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি। সমুদ্রতল থেকে অন্তত ১ কিলোমিটারের বেশি উঁচু বিস্তৃত ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে, যেমন হিমালয় পর্বতমালা। পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু খাড়া ঢালযুক্ত বিস্তীর্ণ সমভূমিকে মালভূমি বলে, যেমন তিব্বত মালভূমি, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি। অন্যদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অল্প উঁচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে, যেমন বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা। সমভূমি কৃষিকাজ ও বসবাসের জন্য সুবিধাজনক, তাই এখানে ঘনবসতি দেখা যায়।

পৃথিবীর মোট আয়তনের মাত্র ২৯ ভাগ হচ্ছে স্থলভাগ, আর বাকি অংশ জলরাশি। পৃথিবীর স্থলভাগকে মানুষ রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন দেশে ভাগ করেছে। অনেকগুলো দেশ নিয়ে আবার একেকটি মহাদেশ। পৃথিবীতে মোট সাতটি মহাদেশ আছে: এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এন্টার্কটিকা। বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত।

পৃথিবীর জলরাশিকেও মানুষ আকৃতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী মহাসাগর,সাগর, উপসাগর,হ্রদ, নদী, হাওড়, বিল, পুকুর প্রভৃতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পৃথিবীতে মহাসাগর রয়েছে ৫ টি, এগুলোর নাম হচ্ছে: প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর।

মানচিত্রে পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর অবস্থান আরও ভালভাবে বোঝা যায় (চিত্র ৯)।

সব জায়গায় সাধারণত পৃথিবীর মার্কেটর প্রজেকশনের মানচিত্রটি দেখা যায়, যেটিতে উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোকে তাদের আয়তনের তুলনায় বড় করে দেখানো হয়েছে।[১] সম্প্রতি আমেরিকার বোস্টনের পাবলিক স্কুল পিটারস প্রোজেকশন মানচিত্রটি আলোচনায় নিয়ে আসে, যেখানে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোকে মার্কেটর প্রজেকশনের চেয়ে বড় দেখা যায় (চিত্র ১০)।[২]

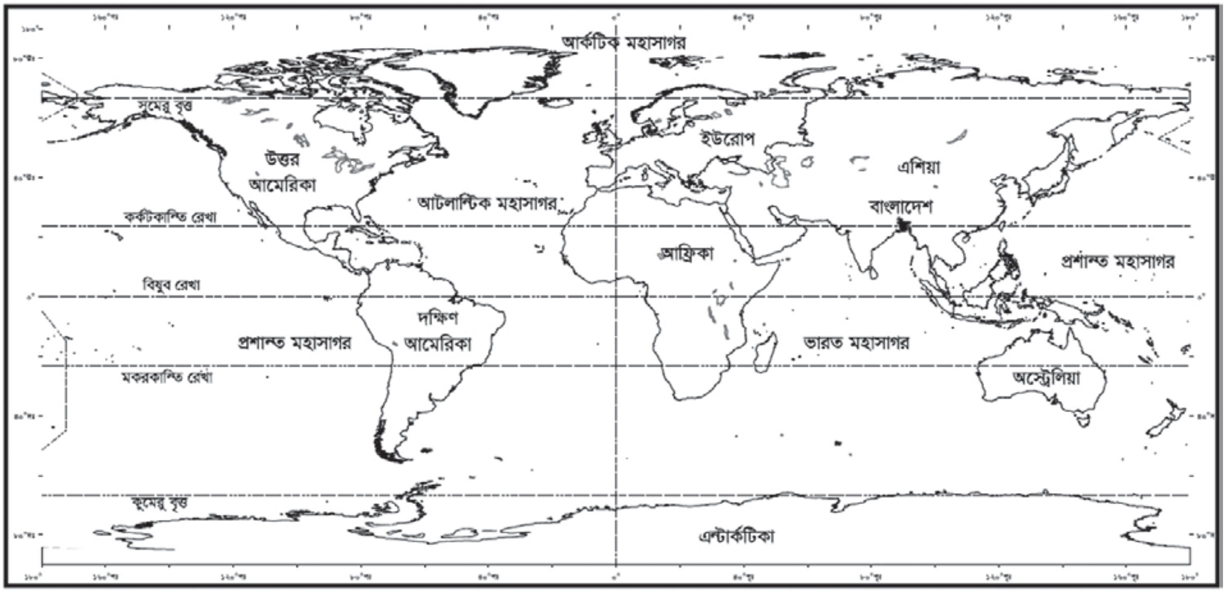

চিত্র ৯: পৃথিবীর মানচিত্র (রাজনৈতিক)

(উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বই, পৃষ্ঠা ৫৯)

চিত্র ১০: পৃথিবীর মানচিত্র (প্রাকৃতিক)

(উৎস: https://www.theguardian.com/education/2017/mar/19/boston-public-schools-world-map-mercator-peters-projection (Photograph: Alamy Stock Photo))

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু

বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে। নদী বিধৌত এ দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের জলরাশি। আর উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য (আরও উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা), পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মিয়ানমার এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কিলোমিটার, মিয়ানমারের সাথে ২৮০ কিলোমিটার এবং বঙ্গোপসাগরের সাথে তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কিলোমিটার। বাংলাদেশের টেরিটোরিয়াল সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল, একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ২০০ নটিক্যাল মাইল এবং সামুদ্রিক মালিকানা উপকূল থেকে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত (১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার)।

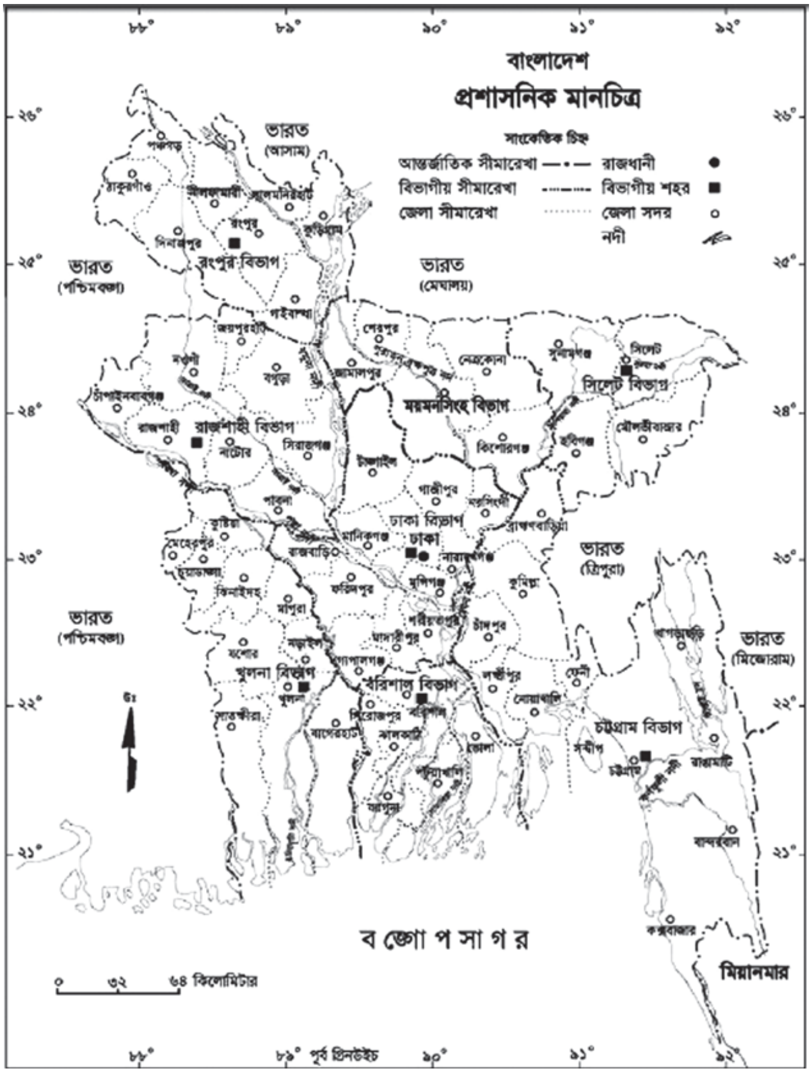

চিত্র ১১: বাংলাদেশের মানচিত্র

(উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নবম-দশম শ্রেণির ভূগোল ও পরিবেশ বই, পৃষ্ঠা ১৪৮)

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা- দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি বড় নদীর অববাহিকায় বাংলাদেশ অবস্থিত। এর ফলে আমাদের দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য নদী, যার সংখ্যা প্রায় ৭০০। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, কর্ণফুলী ইত্যাদি। এ দেশের ভূ-খন্ড উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু। যার ফলে এসব নদী এবং এগুলোর উপনদী ও শাখা নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, অর্থনীতির উপর নদীর প্রভাব ব্যাপক।

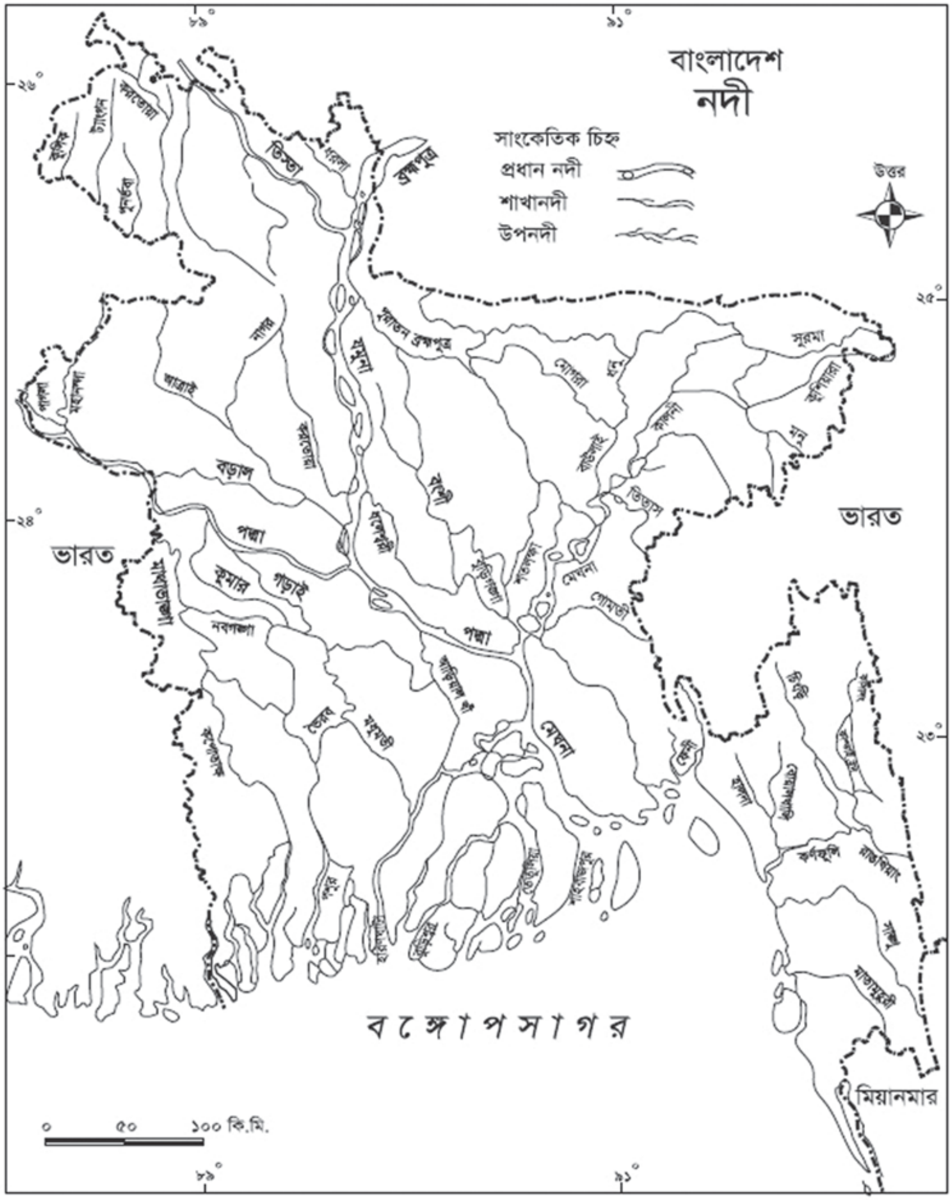

চিত্র ১২: বাংলাদেশের প্রধান নদী

(উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বই, পৃষ্ঠা ৭৫)

উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের কিছু পাহাড়ি অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিমের সীমিত উঁচুভূমি ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। ভূ-প্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, যথা:

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ: প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এসব পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের মোট ভূমির প্রায় ১২%।

১.ক. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ: রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার এবং সর্বোচ্চো শৃঙ্গের নাম তাজিওডং যার উচ্চতা ১,২৩১ মিটার।

১.খ. উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পাহাড়সমূহ: ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়গুলো এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার পাহাড় বা টিলার উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার এবং সর্বোচ্চো ২৪৪ মিটার।

২. প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ: আনুমানিক ২৫,০০০ বছর আগে এসব সোপান বা চত্বর গঠিত হয়েছিল, যা মোট ভূমির প্রায় ৮ ভাগ এলাকা নিয়ে গঠিত এবং সমভূমি থেকে প্রায় ৬ থেকে ৩০ মিটার উঁচু।

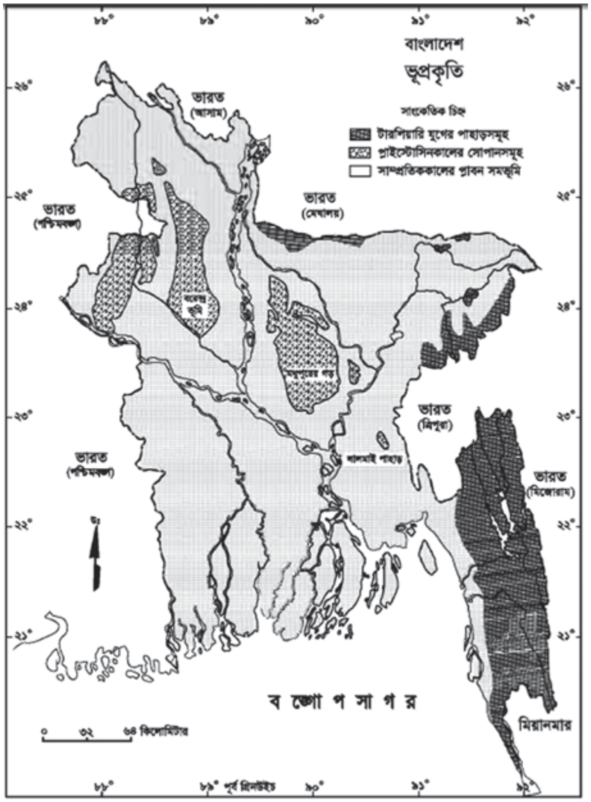

চিত্র ১৩: বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি
(উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নবম-দশম শ্রেণির ভূগোল ও পরিবেশ বই, পৃষ্ঠা ১৫১)

২.ক. বরেন্দ্রভূমি: নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত।

২.খ. মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়: ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত।

২.গ. লালমাই পাহাড়: কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত।

৩. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি: বাংলাদেশের বাকি ৮০ ভাগ হচ্ছে নদী বিধৌত বিস্তীর্ণ সমভূমি। দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া অসংখ্য নদী দিয়ে আসা পলিমাটি জমে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। উর্বর পলিমাটি দ্বারা সৃষ্টি হওয়ায় এ অঞ্চলে সহজেই কৃষি কাজ করা যায়।

বাংলাদেশের জলবায়ু সাধারণত সমভাবাপন্ন, বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৬.১° সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার। বাংলাদেশের জলবায়ুকে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের উপর ভিত্তি করে প্রধানত বর্ষাকাল, শীতকাল ও গরমকালে ভাগ করা যায়।

১. **বর্ষাকাল:** জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক মাসে (জুন-অক্টোবর) এ দেশের উপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়, যা ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসার সময় প্রচুর জলীয় বাস্প বা মেঘ নিয়ে আসে। এই বাতাস উত্তরের হিমালয় পর্বতমালা ও পূর্বের পাহাড়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এসময় প্রচুর বৃষ্টি ঘটায়, যা বছরের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ ভাগ। বাংলাদেশের অবস্থান উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তি রেখায় হওয়ায় এসময় সূর্য কিরণ লম্বভাবে পড়ে। তবে প্রচুর বৃষ্টির কারণে বেশি তাপমাত্রা অনুভূত হয় না।

২. **শীতকাল:** কার্তিক থেকে ফাল্গুন মাস (নভেম্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারী) পর্যন্ত তাপমাত্রা ১১-২৯° সেলসিয়াস থাকে এবং বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। এসময় উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শীতল মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে। এছাড়া এসময় সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে থাকায় সূর্য কিরণ তির্যকভাবে পড়ে এবং তাপমাত্রা কম থাকে।

৩. **গ্রীষ্মকাল:** ফাল্গুন থেকে জৈষ্ঠ্য মাসে (মার্চ-মে) তাপমাত্রা ২১-৩৪° সেলসিয়াস থাকে এবং গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫১ সেন্টিমিটার, যা মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ২০ ভাগ। এসময় সূর্য উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তি রেখার নিকটবর্তী হওয়ায় বায়ুর চাপের পরিবর্তন হয়। ফলে উত্তর-পশ্চিম থেকে প্রবাহিত হওয়া বায়ুর সাথে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সংঘর্ষে বজ্রসহ বৃষ্টি হয়। এছাড়া এপ্রিল-মে মাসে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার কারণে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়।

এছাড়া ভূ-প্রকৃতি, মাটির প্রকারভেদ, পানির গুণাগুণ, জোয়ার ভাটা, ফসল বৈচিত্র্য, চাষ পদ্ধতি, মৌসুম প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে ৩০ টি কৃষি-প্রতিবেশ অঞ্চল বা এলাকায় ভাগ করা হয়েছে।[৩] এই ৩০ টি অঞ্চলকে আবার ৮৮ টি উপ-অঞ্চলে ও ৫৩৫ টি কৃষি-প্রতিবেশ এককে ভাগ করা হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড. ২০১৭. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (নবম-দশম শ্রেণি). ঢাকা (পৃ. ৩৯-৮৬)
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড. ২০১৭. ভূগোল ও পরিবেশ (নবম-দশম শ্রেণি). ঢাকা (পৃ. ৮-৮৮, ১৪৭-১৬০)

দ্বিতীয় অধ্যায়

জলবায়ু পরিবর্তন

আবহাওয়া হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট স্থানের প্রতি দিনের গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বায়ুচাপ, বাতাসের গতি, আর্দ্রতা প্রভৃতির অবস্থা । আর কোন একটি অঞ্চলের দীর্ঘ সময়ের, সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বছরের, আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে । জলবায়ু পরিবর্তন হল এই গড় অবস্থার পরিবর্তন । আবহাওয়া প্রতিদিন পরিবর্তন হলেও, জলবায়ু পরিবর্তন হয় দীর্ঘ সময় ধরে । পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে আসছে, কিন্তু গত এক শতকে এই পরিবর্তনের হার ছিল আশঙ্কাজনক । গত একশ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১৩.৭° সেলসিয়াস থেকে ১৪.৫° সেলসিয়াস হয়েছে (Dutta 2013:2) ।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

মূলত ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা উষ্ণায়নের কারণে সারা পৃথিবীতেই জলবায়ু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে । কিন্তু কেন বা কিভাবে তাপমাত্রা বাড়ছে? আমরা আগেই জেনেছি যে আমাদের বায়ুমন্ডলের বায়ুর মূল উপাদান হল নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন । এছাড়াও কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাস্প ও ওজোন গ্যাস আছে । বায়ুমন্ডলের এই গৌণ গ্যাসগুলোকেই গ্রিনহাউস গ্যাস বলে । প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এসব গ্যাস ছাড়াও মানুষের সৃষ্ট সিএফসি (ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন), এইচএফসি (হাইড্রো ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন), হ্যালন ইত্যাদিও গ্রিনহাউস গ্যাস । এইসব গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ পৃথিবীকে ঘিরে চাদরের মত একটি আচ্ছাদন তৈরি করেছে । ২০০৭ সালের হিসাব অনুযায়ী আমাদের বায়ুমন্ডলের গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের অনুপাত হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড ৭৬%, মিথেন ১৩%, এইচএফসি ৬% এবং নাইট্রাস অক্সাইড ৫% । অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড (Thapa 2015: 10) ।

আমরা জানি যে দিনের বেলায় সূর্যের তাপে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়, আবার রাতের বেলা পৃথিবীপৃষ্ঠ তাপ ছেড়ে দিয়ে ঠান্ডা হয়ে যায় । কিন্তু এই গ্রিনহাউস গ্যাসের চাদরের কারণে পৃথিবীর তাপ মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে পারছে না যা বায়ুমন্ডলকে উত্তপ্ত করে । অর্থাৎ গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ পৃথিবীর গ্রহণ করা তাপমাত্রা ছাড়তে দিচ্ছে না । এভাবে ক্রমে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে ।

মানুষের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে গত এক শতাব্দিতে বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস ব্যাপক হারে বেড়েছে । মূলত এই গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের প্রভাবে আমাদের পৃথিবী গরম হয়ে যাচ্ছে (চিত্র ২; পৃষ্ঠা ৭) ।

আমাদের পৃথিবীতে একটা প্রাকৃতিক কার্বন চক্র আছে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়, আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বায়ুমন্ডল থেকে শোষিত হয়ে যায় । যারা কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে তাদের কার্বন সিঙ্ক বলে । হিসাব করে দেখা গেছে পৃথিবীর কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণের ক্ষমতা বছরে প্রায় ১৫- ১৮ গিগা টন (Dutta 2013: 7) । কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে নির্গত হওয়া

কার্বনের সাথে মানুষের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট কার্বন যুক্ত হচ্ছে। বর্তমানে বাৎসরিক কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ গড়ে প্রায় ৩৭.১ বিলিয়ন টন, যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।[৪] তাহলে অতিরিক্ত এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কোথায় যাবে?

এই অতিরিক্ত কার্বন প্রাকৃতিকভাবে শোষিত হতে না পেরে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৪০০ পিপিএম এর মাইলফলক পার করেছে।[৫] এর মানে হচ্ছে বাতাসের প্রতি ১০ লক্ষ কণার মধ্যে ৪০০ কার্বন ডাই অক্সাইড কণা আছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অন্যতম কারণ এই শোষিত না হতে পারা কার্বন।

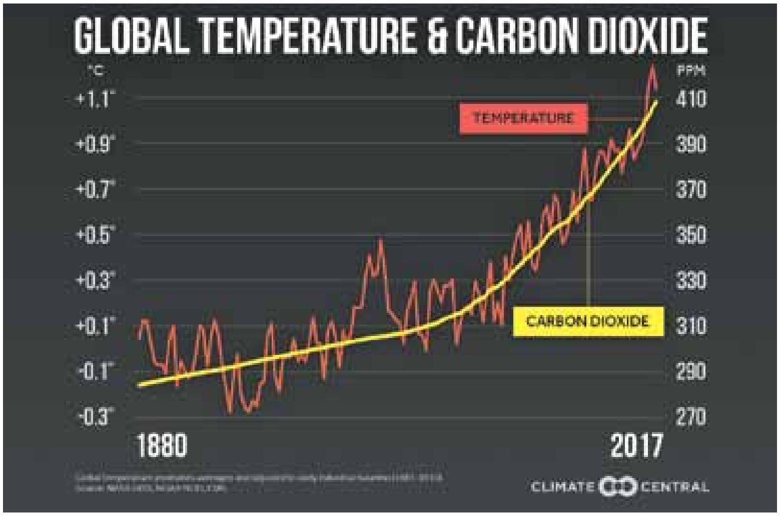

চিত্র ১১ : ১৮৮০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত তাপমাত্রা ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধির হার
(উৎস: http://www.climatecentral.org/gallery/graphics/co2-and-rising-global-temperatures)

তবে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হতে পারে। কারণ, আমাদের পৃথিবীর মাটিতে বায়ুমন্ডলের দ্বিগুণ পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চিত আছে। আর মহাসাগরগুলোতে বায়ুমন্ডলের ৪০- ৫০ গুণ বেশি কার্বনের মজুদ আছে। মাটির ও পানির উষ্ণায়নের ফলে এই জমে থাকা কার্বন বাতাসের সাথে যোগ হওয়ার ভয়াবহ সম্ভাবনা আছে। ইতোমধ্যে রাশিয়ার সাইবেরিয়া ও কানাডার চির-বরফঢাকা অঞ্চলে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক পরিমাণ মিথেন গ্যাস বের হওয়া শুরু হয়েছে।[৬] প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে মারা যাওয়া প্রাণী ও গাছের দেহাবশেষ জমে যে গ্যাস সৃষ্টি হয়েছিল, তা উপরে বরফের স্তর গলে পাতলা হয়ে যাওয়ায় তীব্র বেগে বের হয়ে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মূলত বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধির কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। এই গ্রিনহাউস গ্যাস বেড়ে যাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলো হল:

- শহর এলাকায় শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে বিদ্যুৎ। শহরে প্রতিদিনের কাজে যেসব যন্ত্রপাতী ব্যবহার করা হয়, যেমন কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, লাইট, ফ্যান, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, পানির মটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ইত্যাদি চালানোর জন্য বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। আর বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম উৎস হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, তেল, গ্যাস)। এসব জীবাশ্ম জ্বালানি খনি থেকে তোলা, শোধন করা, পরিবহন ও পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় প্রচুর

গ্রিনহাউস গ্যাস ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ নির্গত হয়। এছাড়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, ফ্রিজ প্রভৃতি থেকেও গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। এসব যন্ত্র এখন গ্রামেও এসব যন্ত্রপাতী ব্যবহার শুরু হয়েছে।

- শিল্প বিপ্লবের পর থেকে পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক পরিমাণ কলকারখানা চালু হয়েছে। এসব কলকারখানা থেকে প্রচুর গ্রিনহাউস গ্যাস ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ নির্গত হয়।
- শহরে মানুষ, খাদ্য ও মালামাল পরিবহন হয় মূলত গাড়ি, বাস, ট্রাক, উড়োজাহাজ ও জাহাজের মাধ্যমে। এগুলো সাধারণত তেল (ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন) বা গ্যাস ব্যবহার করে চলে। এই তেল ও গ্যাস উত্তোলন, শোধন, পরিবহন করতে এবং যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়।
- আধুনিক জীবন যাপনের অংশ হিসেবে আমরা প্রচুর আবর্জনা তৈরি করি, আর এই আবর্জনার অধিকাংশই হচ্ছে প্লাস্টিক। প্লাস্টিকের বোতল, ব্যাগ, মোড়ক প্রভৃতি দীর্ঘদিন পরিবেশে একই অবস্থায় থেকে যায় এবং ইকোসিস্টেম নষ্ট করে দেয়। বাংলাদেশের মাটি, পুকুর, নদী, খাল, বিলসহ পৃথিবীব্যাপী সাগর, মহাসাগরে জমা হওয়া প্লাস্টিক প্রাকৃতিক চক্র ও ইকোসিস্টেম নষ্ট করে দিচ্ছে। এছাড়া পাখি, মাছসহ বিভিন্ন প্রাণি এসব প্লাস্টিক খেয়ে ফেলে অকালে মারা যাচ্ছে।
- কাগজ উৎপাদন, বাণিজ্যিক কৃষিকাজের জন্য জমি বৃদ্ধি, শহরায়ন প্রভৃতি কারণে আমরা বনভূমি ধ্বংস করে ফেলছি। এই বনভূমি আগে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করত। বনভূমি না থাকার কারণে একদিকে যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষিত হতে পারছে না, অন্যদিকে ওখানকার মাটিতে জমে থাকা কার্বন নির্গত হওয়া শুরু হয়েছে।
- সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী যে আধুনিক জাতের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো চাষ করতে সিনথেটিক বা রাসায়নিক সার, বালাইনাশক, সেচের পানি ও যন্ত্রপাতী প্রয়োজন হয়। রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক উৎপাদন করতে যেমন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়, আবার এগুলো পরিবহন ও প্রয়োগের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এছাড়া সেচযন্ত্র, ট্রাক্টর প্রভৃতি আধুনিক তেলনির্ভর যন্ত্রপাতী চালানোর সময় গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। আর সেচের জন্য বিপুল পরিমাণ ভূগর্ভস্থ পানি তুলে ফেলা হচ্ছে।
- আমরা জানি যে রাসায়নিক নির্ভর কৃষিকাজের ফলে পৃথিবীর অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে পরিবেশের সুস্থায়ীত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করি তা পৃথিবীর সকলের জন্য যথেষ্ট, তবুও একাশি কোটির বেশি মানুষ এখনও ক্ষুধার্ত থাকে।[৭] জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে প্রতি বছর প্রায় ১.৩ বিলিয়ন টন খাদ্য অপচয় বা নষ্ট হয়, যা মোট উৎপাদিত খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ।[৮] মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের শতকরা আট ভাগ এই অপচয় হওয়া খাদ্য থেকেই হয়।[৯]
- নদী হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাণ। নদী দখল, দূষণ, বাঁধ- রাস্তা নির্মাণ, অব্যবস্থাপনা, দূর্নীতি প্রভৃতি কারণে নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

- শহরাঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় ইট, কাঁচ ও কংক্রিটে ঢাকা। এর ফলেও তাপমাত্রা শোষিত হয়ে আবার ফিরে যেতে সময় বেশি লাগছে। এরকম অবকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক কার্বন নির্গমন হয়।
- বাণিজ্যিক কারণে অন্য এলাকার বা বহিরাগত গাছ ব্যাপক হারে রোপণের ফলে স্থানীয় ইকোসিস্টেম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
- সর্বোপরি আমাদের আধুনিক ভোগবাদী বিলাসী জীবন যাপনের জন্য পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, আর পরিবেশ দূষণ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

কারা দায়ী

পৃথিবীর জলবায়ু যে এত দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেল তার পেছনে মূলত মানুষের কার্যক্রম দায়ী। তবে বিশ্বের সব অংশের বা দেশের মানুষ সমানভাবে দায়ী নয়। বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাসের ৭০ ভাগ নির্গমন করে মাত্র কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ। এরা হচ্ছে চীন, আমেরিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২৮ টি দেশ, ভারত, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, জাপান, কানাডা ও মেক্সিকো। স্বাভাবিকভাবেই এসব দেশের গ্রামের অধিবাসীদের চেয়ে শহরাঞ্চলের মানুষ তুলনামূলক বেশি কার্বন নির্গমন করে। সিডিপি কার্বন মেজর রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৮৮ সালে থেকে যে পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গত হয়েছে তার ৭০ ভাগের জন্য দায়ী মাত্র ১০০ টি কোম্পানি।[১০]

গ্লোবাল ক্লাইমেট প্রজেক্ট- এর গবেষণা[১১] অনুযায়ী জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার ও কল-কারখানা থেকে কার্বন নির্গমনের হার ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রায় একই ছিল, যা বিশ্ববাসীকে কিছুটা আশাবাদী করেছিল। কিন্তু ২০১৭ সালে নির্গমনের পরিমাণ আবার ১.৬ ভাগ বেড়ে গেছে, যা ২০১৮ সালে ২.৭ ভাগ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কার্বন নির্গমনের হার যুক্তরাষ্ট্রে ২.৫ ভাগ, চীনে ৪.৭ ভাগ ও ভারতে ৬.৩ ভাগ হারে বাড়ছে। অন্যদিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ নির্গমনের পরিমাণ ০.৭ ভাগ কমাতে সক্ষম হয়েছে। আর অন্যান্য দেশের নির্গমনের হার বাড়ছে ১.৮ ভাগ হারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন মানবসভ্যতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবের ফলে মানুষের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান প্রভাবগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে পৃথিবী গরম হয়ে যাওয়ার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু, কানাডা, সাইবেরিয়া এবং পর্বতচূড়ার বরফ ও হিমবাহ ব্যাপক হারে গলে যাচ্ছে। এই বরফগলা পানি মহাসাগরে যোগ হয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে বিশাল এলাকা ডুবে যাওয়ার ও লবণাক্ত হয়ে যাওয়ার ভয়াবহ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফলে এসব এলাকায় বসবাস করা মানুষ ও অন্যান্য জীব ব্যাপক ঝুঁকির মধ্যে আছে। ইতোমধ্যে অনেক মানুষ জলবায়ুজনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও সংকটের কারণে বাস্তুহারা হয়ে অনত্র্য চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

- বরফ মানে হচ্ছে মিঠা পানি, এই বরফ গলে মহাসাগরে যোগ হওয়ায়, লবণাক্ত পানির অনুপাত বেড়ে যাচ্ছে। এই লবণাক্ত পানির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় তা উপকূলীয় এলাকায় মাটির নিচ দিয়ে প্রবেশ করছে। মাটিতে ও এখানকার জলাশয়ে বসবাসকারী জীবের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন মিঠা পানি, যার পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। আর আধুনিক কৃষিকাজের ফলে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এই প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করছে।
- আগে যেসব এলাকা বরফ দিয়ে ঢাকা থাকার ফলে সাদা হয়ে ছিল, সেখানে সূর্যের আলো পড়ে প্রতিফলিত হয়ে যেত। কিন্তু বরফ গলে যাওয়ার ফলে সেখান থেকে আর তাপ প্রতিফলিত হচ্ছে না, বরং সমুদ্রপৃষ্ঠ তথা পৃধিবীপৃষ্ঠ তাপ শোষণ করে আরও গরম হয়ে যাচ্ছে। আর সাগরের পানির তাপ বেড়ে গেলে অনেক সামূদ্রিক প্রাণী, বিশেষ করে প্রবাল ও মাছ, মারা যেতে পারে।
- বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় মহাসাগরগুলো আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষিত বা দ্রবীভূত হচ্ছে। এর ফলে পিএইচ বেড়ে যাওয়ায় পানি এসিডিক বা অম্লীয় হয়ে যাচ্ছে। এই পানিতে অনেক জলজ জীবই আর বেঁচে থাকতে পারবে না, যা পৃথিবীর সার্বিক খাদ্য শৃঙ্খলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে।
- পরিবর্তিত জলবায়ু ও বাসস্থান ধ্বংসের কারণে অনেক স্থলজ প্রাণীও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।
- বাংলাদেশসহ পৃথিবীব্যাপী খরার প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে ও মরুকরণ দেখা দিচ্ছে।
- অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিসহ মৌসুম ও অঞ্চলভিত্তিক বৃষ্টিপাতের ব্যাপক তারতম্য দেখা দিচ্ছে।
- ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, সুনামি, তাপপ্রবাহ, শৈত্যপ্রবাহ, বন্যার মত প্রাকৃতিক দূর্যোগগুলো ভয়াবহ মাত্রায় সংগঠিত হচ্ছে।
- তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা প্রভৃতির সাথে উদ্ভিদের নানা শরীরবৃত্তীয় কাজ জড়িত। এ কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন উদ্ভিদের জৈবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার ভয়াবহ প্রভাব পড়বে খাদ্য শৃঙ্খলেও কৃষি সেক্টরে তথা খাদ্য নিরাপত্তায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ফসলের শত্রু পোকার সংখ্যাও বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কৃষক বা জেলেদের মত প্রকৃতি নির্ভর জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সরাসরি বুঝতে পারেন। ঘন ঘন উত্তাল আবহাওয়া এবং চেনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের অচেনা আচরণ ও প্রকোপ বৃদ্ধি তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক রাজনীতি

"১৯৫০ এর দশকেই বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করেছিলেন যে জলবায়ু পরিবর্তন জনগণের জন্য ব্যাপক ঝুঁকির কারণ হতে পারে। ১৯৬৫ সালে প্রখ্যাত সমূদ্রবিজ্ঞানী রজার রিভেলী ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, ক্রমে বেড়ে যাওয়া কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমন্ডলে আটকে গ্রিনহাউসের মাধ্যমে নিচের স্তরের বাতাসের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। ১৯৬৯ সালে বিজ্ঞানী চার্লস কিলিং বলেছিলেন যে, বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণের ব্যাপক পরিবর্তন জলবায়ু পরিবর্তন ঘটাবে। জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে ব্যবসা করা কোম্পানিগুলোও এসব বিষয়ে অবগত ছিল। ১৯৭৭ সাল থেকেই বিপি, শেভরন, কনকোফিলিপস, এক্সন মোবিল, শেলের মত কোম্পানিগুলো মার্কিন কংগ্রেসের শুনানীতে অংশগ্রহণ করত, যেখানে কার্বন নির্গমন, গ্রিনহাউস ক্রিয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের মত বিষয়গুলো আলোচনা হত। তবে বিশ্বব্যাপি জীবাশ্ম জ্বালানি (তেল/ কয়লা/ গ্যাস) উত্তোলন, পরিশোধন এবং বিক্রয় অনেক বড় ও লাভজনক শিল্প। ২০১৫ সালে শুধু বৈশ্বিক তেল ও গ্যাস সেক্টর থেকেই ৪ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার আয় হয়েছে। 'ফরচুন গ্লোবাল ৫০০'- এর সবচেয়ে বড় কোম্পানির তালিকার প্রথম ছয়টির পাঁচটি কোম্পানিই তেল (প্রেট্রোলিয়াম) ব্যবসার সাথে জড়িত। বিগত ২৫০ বছরে বায়ুমন্ডলে যতটুকু শিল্পজাত কার্বন নির্গমন হয়েছে, তার দুই-তৃতীয়াংশই করেছে মাত্র ৯০ টি কোম্পানি, যারা জীবাশ্ম জ্বালানি ও সিমেন্ট উৎপাদন ও ব্যবসার সাথে জড়িত।"[১২]

পৃথিবীর গরম হয়ে যাওয়া বা জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে ভূগোল, সমূদ্রবিজ্ঞান, ভূ-রসায়ন, সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের অসংখ্য গবেষকদের আশঙ্কা ও সতর্কবার্তাকে সত্তরের দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত পদার্থবিদ, গণিতবিদ ও আবহাওয়াবিদদের অনেকেই পাত্তা দেননি, এ সংক্রান্ত তথ্য- উপাত্তকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, এমনকি বিজ্ঞান-বিরোধীও বলা হয়েছে (Deb 2009: 469)। পরবর্তিতে বৈশ্বিক জলবায়ু নির্দেশক ভৌত-গাণিতিক মডেলে বিভিন্ন জটিল প্রাচীন লিপি, সামুদ্রিক ও প্রতিবেশ বিষয়ক বিপুল সংখ্যক প্যারামিটার যোগ করে, সুপার কম্পিউটারের সহায়তায় বিশ্লেষণ করা হলে, বৈশ্বিক কার্বন নির্গমন ও তাপমাত্রার আশঙ্কাজনক বৃদ্ধি এবং এর ভয়াবহ প্রতিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের ভবিষ্যতবাণী পাওয়া গেলে আবহাওয়াবিদ, পদার্থবিদ ও গণিতবিদরাও জলবায়ু পরিবর্তনকে স্বীকার করেন (Deb 2009: 469- 470)।

'ইনসাইড ক্লাইমেট নিউজ' এর তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু বিশ্বব্যাপি তোলপাড় ফেলার ১১ বছর আগেই, ১৯৭৭ সালে, এক্সন কোম্পানি- বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল ও গ্যাস কোম্পানি এক্সন মোবিল (Exxon Mobil)- বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর উষ্ণায়ণের সম্ভাবনার বিষয়ে বিস্তারিত জানত।[১৩] কিন্তু তারা জলবায়ু সংকট স্বীকার না করে ভ্রান্ত তথ্য সরবরাহ করেছিল যাতে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধের জন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করা হয়। এমনকি

তারা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং বড় বড় তেল ও অটোমোবাইল কোম্পানিসমূহের পক্ষে লবি করার জন্য, ১৯৮৯ সালে 'গ্লোবাল ক্লাইমেট কোয়ালিশন' গঠন করে, যা ২০০২ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চীন যেন কিয়োটো প্রটোকল বা আন্তর্জাতিক জলবায়ু চুক্তিতে স্বাক্ষর না করে সেজন্যও এই কোম্পানি কাজ করেছিল। 'ইনসাইড ক্লাইমেট নিউজ' এর এই তদন্ত প্রতিবেদনটি ২০১৬ সালের পুলিৎজার পুরস্কারের ফাইনালিস্ট নির্বাচিত হয়।[১৪] প্রায় ২৫০ বছর আগে শুরু হওয়া শিল্প বিপ্লবের (১৭৫১) সময় থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নির্গত হওয়া মোট শিল্পজাত কার্বনের অর্ধেকের বেশি নির্গমন হয়েছে ১৯৮৮ সালের পর, অথচ তখন থেকেই অন্যান্য সকলের মতই জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে কাজ করা কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে অবগত ছিল।[১৫]

১৯৮৮ সাল জলবায়ু পরিবর্তনের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। এসময় আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসা-র আবহাওয়া বিজ্ঞানী জেমস হানসেন কংগ্রেসে ঘোষণা করেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনে মানুষের ভূমিকা বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি দ্বারা নিশ্চিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করার জন্য জাতিসংঘ 'ইন্টারগভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)' প্রতিষ্ঠা করে। পৃথিবীর গরম হয়ে যাওয়া (global warming) খবরের কাগজের প্রথম পাতায় শিরোনাম হিসেবে নিয়মিতভাবে আসতে শুরু করে। ১৯৯০ সালে আইপিসিসি প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও শহরে 'ধরিত্রী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বিশ্বনেতারা পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী রাখার তাগিদে ৩টি চুক্তি করতে বাধ্য হন: ১. জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন বা (UNFCCC), ২. জীববৈচিত্র্য কনভেশন, ও ৩. মরুকরণ রোধ কনভেনশন।

এসময় পৃথিবীর সকল দেশকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের উপর ভিত্তি করে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়: ১. এনেক্স ১- শিল্পোন্নত দেশ যারা বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে; ২. এনেক্স ২- যারা আগে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করত কিন্তু এখন কম করে; ও ৩. নন-এনেক্স- অন্যান্য দেশসমূহ। শিল্পোন্নত দেশগুলোকে বলা হয় কার্বন নির্গমন কমানোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য দেশকে বলা হয় তারা যেন এই ভুল না করে।

১৯৯৪ সালে ৫৮টি পার্টি (রাষ্ট্র ও সংগঠন) কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন (UNFCCC) গৃহীত হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে এই পার্টিগুলোর মধ্যে প্রতিবছর নিয়মিত আলোচনার জন্য বিভিন্ন শহরে কনফারেন্স অফ পার্টিজ (কপ) আয়োজন করা হয়। ১৯৯৫ এ কপ১ আয়োজিত হয়েছিল, আর এ বছর কপ২৪ হল। ১৯৯২ সালের পর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রথম কূটনৈতিক সফলতা আসে ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে আয়োজিত সম্মেলন কপ৩ এ। এসময়, কিয়োটো প্রটোকলে, ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের তুলনায় গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ৫.২ শতাংশ কমানোর ব্যাপারে দেশসমূহ একমত হয়। কিন্তু আমেরিকা, চীন প্রভৃতি দেশের অসহযোগিতার জন্য পরবর্তিতে এই চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারেনি এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হ্রাসের লক্ষ্যও অর্জিত হয় নি।

১৯৯২ সালে জলবায়ু কনভেনশনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের (mitigation) উপর, অর্থাৎ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঠেকানোর জন্য মানব সমাজ কি পদক্ষেপ নিতে পারে তার উপর। পরবর্তিতে বোঝা গেল পৃথিবীর তাপমাত্রা ইতোমধ্যে বাড়তে শুরু করেছে। আমরা যাই করি না কেন এটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যাবে না, কেননা ইতোমধ্যে বায়ুমন্ডলে জমা হওয়া কার্বন ডাই অক্সাইড তাপমাত্রা বাড়াতেই থাকবে। তখন মনোযোগ দেওয়া শুরু হয় অভিযোজনের (adaptation) দিকে, মানে মানব

সমাজ পরিবর্তিত জলবায়ুতে কিভাবে টিকে থাকবে তার উপর। এর আওতায় বিভিন্ন প্রযুক্তি শিল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আসা শুরু হয়। পরবর্তিতে লস এন্ড ড্যামেজ (loss & damage) নামে তৃতীয় একটি বিষয় এসেছে। যেসব জলবায়ুজনিত ক্ষতি মেরামত বা সংস্কার বা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব সেগুলোকে ড্যামেজ এবং যেসব সম্ভব নয় সেগুলোকে লস বলা হয়। অভিযোজনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও জলবায়ু জনিত যেসব লস এন্ড ড্যামেজ হবে সেগুলোর দায়ভার থেকে এই ধারণার উৎপত্তি। এছাড়া "উন্নয়ন" কার্যক্রমকে সুস্থায়ী করার লক্ষ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলোকে সমান গুরুত্ব দিয়ে ২০১৫-২০৩০ সালের জন্য "সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষমালা" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৯৯০ সাল থেকেই ক্ষুদ্র দ্বীপগুলোর জোট জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করে আসছিল। তবে এই বিষয়টি সরাসরি জলবায়ু-ন্যায্যতার (climate justice) বিতর্কের সাথে জড়িত, কেননা যারা জলবায়ুজনিত ক্ষতির স্বীকার হচ্ছে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয়। জলবায়ু আলোচনার শুরু থেকেই দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলো উত্তর গোলার্ধের শিল্পোন্নত দেশগুলোর কাছে এই দাবি তুলে আসছে। সাগরের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ফলে উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপসমূহ ডুবে গেলে ঐসব এলাকার জমি হারানো মানুষ কোথায় যাবে? লবণাক্ততা ও খরার কারণে কৃষির যে ব্যাপক ক্ষতি হবে তার ক্ষতিপূরণ কে দিবে? এসব দূর্যোগের ফলে জমি ও কাজ হারানো মানুষ কোথায় যাবে? হাজার বছর ধরে যেসব ইকোসিস্টেম গড়ে উঠেছে এবং ঐসব ইকোসিস্টেমে বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাস করছে তাদের দাম কে দিবে? তাদের দাম কে নির্ধারণ করবে? আর এসবের দাম নির্ধারণ কি আদৌ সম্ভব? ২০০৭ সালের বালি জলবায়ু সম্মেলনে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয় লস এন্ড ড্যামেজ শিরোনামের আওতায়। এসময় জলবায়ু পরিবর্তন এডাপটেশন ফান্ড গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তখন শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলো বলা শুরু করল যে অন্যরা কার্বন নির্গমন না কমালে তারাও কমাবে না। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর জনপ্রতি কার্বন নির্গমন হার অনেক বেশি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোও কার্বন নির্গমন ক্রমে বাড়াচ্ছে।

যাই হোক ২০০৯ সালের কোপেনহেগেন সম্মেলনে দেশগুলো 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড' গঠন করার ব্যাপারে একমত হয়, যার আওতায় ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছরের জলবায়ু তহবিলের জন্য ১০০ বিলিয়ন ইউরো যোগাড় করা হবে। তবে জাতিসংঘেরই অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোর প্রয়োজন হবে বছরে ১৪০ থেকে ৩০০ বিলিয়ন ইউরো, যা ২০৫০ সাল নাগাদ বেড়ে ৫০০ বিলিয়ন ইউরো হবে। অন্যদিকে পরিবেশগত প্রভাবগুলো টাকা দিয়ে থামানো যাবে না। যাই হোক ২০১০ সালের কানকুন সম্মেলনে লস এন্ড ড্যামেজ বিষয়ে কাজ করার জন্য আলাদা ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। ২০১৩ সালে ওয়ারশ সম্মেলনে এই সম্পর্কিত আরও তথ্য সংগ্রহ ও কর্ম-পরিকল্পনা করার জন্য একটা মেকানিজম গড়ে তোলা হয়। কিছু বিষয় অমিমাংশিত থাকলেও এই কর্ম-পরিকল্পনা জার্মানীর বন শহরে কপ২৩ সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়। তবে লস ও ড্যামেজের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ধারণ ও এই ক্ষতিপূরণ কে দিবে তা নিয়ে এখনও আলোচনা ও দর-কষাকষি চলছে।

২০১২-পরবর্তী সময়ের জন্য একটা নতুন জলবায়ু চুক্তি করার কথা ছিল ২০০৯ সালের কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলনে। কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলনের ব্যার্থতার পর প্রায় ছয় বছর আলোচনা ও দর কষাকষির মাধ্যমে ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর জলবায়ু সংক্রান্ত কনভেনশনের ১৯৬ টি পার্টি 'প্যারিস চুক্তি' গ্রহণ করে যা ২০২০ সাল থেকে বাস্তবায়িত হবে। প্যারিস সম্মেলন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে

আবার জনসাধারণের সামনে নিয়ে আসে এবং সংশ্লিষ্ট সকলে এটিকে মানব সমাজের প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে মেনে নেয় । যারা জলবায়ু পরিবর্তনকে অগ্রাহ্য করে আসছিল বা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হিসেবে মানুষের কার্যক্রমকে অস্বীকার করত তারা এই সম্মেলনে তেমন কোন প্রভাব রাখতে পারেনি । এই চুক্তির মূল বিষয়গুলো হচ্ছে:

- বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা প্রাক-শিল্প সময়ের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়তে না দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ এবং এই বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা ।
- এই শতকের দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার শূন্যতে নিয়ে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ ।
- জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের জন্য সকল দেশের জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা স্থাপন । এই প্রেক্ষিতে প্রত্যেক দেশ নিজেদের মত জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি কমানোর জন্য জাতীয় পরিকল্পনা (NDC- Nationally determinded contributions) তৈরি করবে এবং জমা দিবে । অর্থাৎ কিয়োটো প্রটোকলের মত এখানে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য দেশগুলোর জন্য কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বেঁধে দেওয়া হবে না, বরং প্রত্যেক দেশ নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে । জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশগুলো প্রয়োজনে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহায়তা বিনিময় ও যৌথভাবে কাজ করবে । এই কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য স্বচ্ছ ও দক্ষ কাঠামো তৈরি করা হবে ।
- প্রত্যেক দেশের পরিস্থিতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই চুক্তি বাস্তবায়িত হবে । যার মানে হচ্ছে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন কমানোর ব্যাপারে কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা করতে হবে ।
- সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন ও ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য গৃহিত কার্যক্রমে সহায়তা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি প্রদান । লস ও ড্যামেজ সংক্রান্ত ওয়ারশ মেকানিজম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তবে এই চুক্তি কোন বাধ্যবাধকতা বা ক্ষতিপূরণের জন্য প্রযোজ্য হবে না ।
- জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার যোগান দেওয়ার বৈশ্বিক লক্ষ্য নির্ধারণের অঙ্গীকার ।
- ২০২৩ সালে কপ এই চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপ করবে এবং পরবর্তিতে প্রতি পাঁচ বছর পর পর পরিমাপ করা হবে ।
- এটি একটি পারস্পরিক সম্মতিমূলক চুক্তি, যার আওতায় কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না ।

শর্তানুযায়ী ৫৫টি দেশের অনুমোদন পাওয়ার পর -যারা মিলিতভাবে বৈশ্বিক কার্বন ডাই অক্সাইডের অন্তত ৫৫ শতাংশ নির্গমন করে-, ২০১৬ সালের ৪ নভেম্বর প্যারিস চুক্তি অফিসিয়ালি কার্যকর হওয়া শুরু হয় । কিয়োটো প্রটোকল কার্যকর হতে যেখানে কয়েক বছর লেগেছিল, সেখানে এক বছরেরও কম সময়ে এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দেশের অনুমোদন পাওয়া যায় । কিন্তু ২০১৭-তে ডোনাল্ড

ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আগস্ট মাসে জাতিসংঘকে জানিয়ে দেন যে যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তিতে থাকবে না। শিল্প ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে তার এই সিদ্ধান্ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, শিল্প ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আসলে কি চাই। কোটি কোটি মানুষ জলবায়ু ঝুঁকির মধ্যে পড়লে তাদের কিছু যায় আসেনা। তবে এই চুক্তি থেকে বের হতে অন্তত ৩ বছর সময় লাগে। এর মধ্যে চাইলে সংশ্লিষ্ট দেশ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরের দিন এই তিন বছর শেষ হবে।

যাই হোক জলবায়ু নিরাপত্তার দিক থেকে অনেকেই প্যারিস চুক্তিকেও ব্যার্থতা হিসেবে দেখছেন। কারণ চুক্তির লক্ষ্যগুলো এবং যেসব কার্যক্রম বাস্তাবয়নে ঐক্যমত হয়েছে তার মধ্যে বিস্তর ফাঁক আছে। অন্যদিকে কিয়োটো প্রটোকলে যেখানে প্রতি দেশের জন্য নির্গমন কমানোর বাধ্যবাধকতা ছিল, সেখানে প্যারিস চুক্তিতে দেশগুলো নির্গমন কমানোর ব্যাপারে নিজেদের ইচ্ছামত প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। চুক্তিভুক্ত দেশগুলো নির্গমন কমানোর ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে তা ১.৫ বা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর লক্ষ্য পূরণের জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়। এমনকি সকল দেশ যদি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তাহলেও তাপমাত্রা প্রায় ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে।

২০১৫ সালে গৃহীত প্যারিস চুক্তির তিন বছর পার হয়ে গেলেও, কিভাবে চুক্তি বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতা হয়নি। ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত কপ২৩ এ অংশগ্রহণকারী দেশ ও সংগঠনসমূহ প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একটি গাইডলাইন বা রুলবুক (প্যারিস এগ্রিমেন্ট ওয়ার্ক প্রোগ্রাম) তৈরি করতে একমত হলেও তা করা সম্ভব হয়নি। তাই এ নিয়ে দেনদরবার চলছেই। এজন্য ২০১৮ সালে মে মাসে বন শহরে ইন্টার-সেশন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাংককে অতিরিক্ত জরুরি সভা আয়োজন করা হয়।

২০১৮ সালের জলবায়ু সম্মেলন কপ২৪-এর দুই মাস আগে প্রকাশিত আইপিসিসি-র বিশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রাক-শিল্প সময়ের গড় তাপমাত্রার চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেলেও ভয়ঙ্কর পরিবেশগত প্রভাব পড়বে। আর মানুষের হাতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ব্যাপকভাবে কমানোর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনকে স্থির রাখার চেষ্টা করার জন্য আর মাত্র ১২ বছর সময় আছে।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পোল্যান্ডের কাটোওয়াইস শহরে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ জাতিসংঘ বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন বা কপ২৪ অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য রুলবুকের প্রধান অংশগুলোর ব্যাপারে একমত হয়, যার মধ্যে আছে কিভাবে দেশগুলো প্রতিশ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, প্রতিবেদন জমা ও যাচাই করাবে প্রভৃতি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান বৈজ্ঞানিক ইস্যুর -গ্রিনহাউন গ্যাস নির্গমন কমানো- ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি, যদিও বর্তমান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে। আইপিসিসির বিজ্ঞানীদের সুপারিশ আমলে না নেওয়ার জন্য সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব এবং কুয়েত জোট বাঁধে। ব্রাজিল ২০১৯ সালের সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে, যা জলবায়ু ইস্যুতে তাদের উদাসীনতারই সংকেত দেয়। অন্যদিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, কয়েকটি উন্নত দেশ এবং অন্যান্য দরিদ্র ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে অঙ্গীকার

করেছে। যাই হোক আগামী বছর ২০১৯ সালের জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন হবে চিলিতে, যেখানে প্যারিস চুক্তির রুলবুক চূড়ান্ত করা হবে এবং ভবিষ্যত নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্য নির্ধারণের কাজ শুরু হবে। তবে ২০২০ সালের জলবায়ু সম্মেলনটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে, কেননা ঐ বছর দেশগুলোর প্রতিশ্রুত নির্গমন হ্রাসের সময়সীমা শেষ হবে এবং ২০৩০ সালের নিগর্মন হ্রাসের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে।

জলবায়ু বিষয়ক সর্বশেষ যে রাজনৈতিক অবস্থা, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, উন্নত দেশগুলো গ্রিনহাউস কমানোর জন্য সকল দেশের জন্য অভিন্ন নীতির কথা বলছে। অর্থাৎ তাদের মতে উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশকেই একই সময়ের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে হবে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অবস্থার দোহাই দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো এজন্য বেশি সময় দাবী করছে। তাদের দাবি নির্গমন কমানোর জন্য তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করা যাবে না, কারণ তারা কার্বন নির্গমন কমিয়ে দিলে তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এই দ্বন্দের মাধ্যমে কার্বন নির্গমন কমানো এবং জলবায়ু ক্ষতিপূরণের মত বিষয়গুলো বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় রাজনীতি

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর গঠিত অস্থায়ী সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহানের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়সমূহ গবেষণা তথা জাতীয় উন্নয়নের সামগ্রিক চিত্র ও সম্ভাবনা পর্যালোচনা করার জন্য ২৯ টি দল বা টাস্কফোর্স করা হয়েছিল এবং ২৯ টি প্রতিবেদন তৈরি হয়। এসব প্রতিবেদনের বক্তব্য পর্যালোচনা সাপেক্ষে অর্থনীতিবিদ মোঃ আনিসুর রহমান বলেছিলেন, "অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টাস্কফোর্সগুলোর রিপোর্টে পরিবেশ সম্বন্ধে তেমন সচেতনতা দেখা যায় না। ..অর্থনীতির ওপর টাস্কফোর্সগুলোর রিপোর্টে পরিবেশের প্রশ্ন এড়িয়ে যেয়ে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হয়েছে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে তার অনেকগুলোই দেশের ধ্বংসোন্মুখ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বিচারের প্রয়োজন। স্পষ্টতই আমাদের অর্থনীতি শিক্ষায় একটি বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে যে, আমরা অর্থনীতির গতানুগতিক অত্যন্ত সংকীর্ণ গন্ডীর বাইরে বেরোতে পারছি না এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রশ্নাদি সামগ্রিকভাবে দেখতে পারছি না। ..আমাদের অর্থনীতির পরিবেশ সম্পর্কিত সংস্কৃতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমাদের বেঁচে থাকার একটি মৌলিক পূর্বশর্ত" (রহমান ১৯৯৩: ১২১- ১২২)।

উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় রাজনীতি বিষয়ে ধারণা পাওয়ার জন্য এখানে বিদেশী পরামর্শ ও প্রযুক্তিনির্ভর তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হল:

ঘটনা ১ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত 'ব্রি ধান২৯' বোরো মৌসুমের একটি ধানের জাত, যা ১৯৯৪ সালে চাষাবাদের অনুমতি প্রদান করা হয়। ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের মতে, গুণে ও মানে এটি আধুনিক ধানের সেরা এবং বোরো মৌসুমের সবচেয়ে জনপ্রিয় উচ্চফলন ক্ষমতা সম্পন্ন জাত (উফসি), যা চাষ করতে ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হয়।[১৬] কিন্তু

২০০৯ সালের গবেষণায় দেখা গেছে এই ধানের চালের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) অনেক বেশি ।[১৭] গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি এমন খাবার গ্রহণ করলে রক্তে গ্লুকোজ বা চিনির পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যায়, আর চিনির পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি হলে রক্ত বিষাক্ত হয়ে যায় এবং এটি অন্ধত্ব, কিডনী নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ ও হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ।[১৮] অর্থাৎ এই ধানের প্রসারের ফলে সারা দেশে উপরোক্ত রোগগুলোর প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেছে বলে ধারণা করা যায় । কিন্তু উপরে উল্লেখিত গবেষণালব্ধ তথ্যের কথা দেশের জনসাধারণ এখনও জানেন না । এমনকি বাংলাদেশে চালে ভিটামিন এ যুক্ত করার জন্য যে জিনগত পরিবর্তিত (জিএমও) গোল্ডেন রাইস তৈরির প্রক্রিয়া চলছে সেখানেও ব্রি২৯ ধান ব্যবহার করা হচ্ছে ।[১৯]

ঘটনা ২ ঃ "১৯৬০ এর দশকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ইউনিসেফের সহায়তায় গ্রাম বাংলায় সুপেয় পানি সমস্যার সমাধানের জন্য টিউব ওয়েল স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করে। কারণ খাওয়ার কাজে জলাশয়ের পানি ব্যবহার করাকে পানিবাহিত রোগের (ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি) অন্যতম কারণ বলে মনে করা হত । স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ টিউব ওয়েল বসানো অব্যাহত রাখে । ১৯৮০ সালে গ্রাম বাংলায় টিউব ওয়েলের সংখ্যা হয় প্রায় ৪৬ লক্ষ । ১৯৮০-র দশকে আরও প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ টিউব ওয়েল বসানো হয় । টিউব ওয়েলের পানি ব্যবহারের কারণে দেশে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যায় । ইউনিসেফ এই টিউব ওয়েল বসানোর কার্যক্রমকে অসাধারণ সফলতা হিসেবে দাবি করে। কিন্তু সমস্যা ধরা পড়ে পশ্চিম বাংলায় ১৯৮২ সালেই । ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার জানতে পারে যে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম বাংলায় আসা রোগীদের শরীরে আর্সেনিক বিষ পাওয়া গেছে । তারপরও ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা তা পরীক্ষার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । অবশেষে ১৯৯৩ সালে পরীক্ষায় আর্সেনিক পাওয়া যায় । কিন্তু ১৯৯৮ সালে আর্সেনিক জরিপ হওয়ার আগে পর্যন্ত সরকার বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই সমস্যাকে স্বীকার করেনি । অর্থাৎ আর্সেনিক বিষক্রিয়াকে চিহ্নিত করতেই ১৩ বছর (১৯৮৫ থেকে ১৯৯৮) নষ্ট হয় । এ পর্যন্ত পরীক্ষা করা ৪৭ লক্ষ টিউব ওয়েলের মধ্যে অন্তত ১৪ লক্ষ টিউব ওয়েলে সরকার নির্ধারিত নিরাপদ মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক বিষ পাওয়া গেছে । অর্থাৎ প্রতি ৫টি টিউব ওয়েলের ১টি তে প্রাণঘাতি বিষাক্ত পানি পাওয়া গেছে। আট হাজারের বেশি গ্রামের ৮০ শতাংশ টিউব ওয়েলের পানি আর্সেনিক দূষণের শিকার হয়েছে। প্রায় ২ কোটির বেশি মানুষ এই আর্সেনিক বিষযুক্ত পানি পান করেছে।"[২০] বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ (ইউনিসেফ, বিশ্ব ব্যাংক) সুপেয় পানির উৎস হিসেবে এই বিপুল পরিমাণ টিউব ওয়েল স্থাপন করার আগে বা পরে পানির গুণগত মান পরীক্ষা করার প্রয়োজন মনে করেনি ।

ঘটনা ৩ ঃ ১৯৬৩- ৬৭ সালে খুলনা বিভাগের বিল ডাকাতিয়া এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইউএস এইডের সহায়তায় সরকারি পোল্ডার নির্মাণ করা হয় । ফলে পরবর্তিতে সে এলাকায় ব্যাপক জলাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং ১৯৯০ সালে এলাকাবাসী সম্মিলিতভাবে বাঁধ কেটে দেন । এ প্রসঙ্গে আনিসুর রহমান উল্লেখ করেছিলেন, "সরকারী বিজ্ঞানের দীর্ঘমেয়াদী ফল অত্যন্ত মারাত্মক হয়েছে, আর এই বিজ্ঞান জনগণকে তার সৃষ্ট এই মহাবিপর্যয় থেকে বাঁচাতে আর ফিরে না আসায় বাঁধ কেটে দেওয়া ছাড়া নিজেদের

বাঁচবার জন্য জনগণের কাছে বোধ হয় আর কোন পথ ছিল না” ।

উপরের তিনটি উদাহরণ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, মূলত বিদেশী পরামর্শে আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হলেও তা পরবর্তিতে জনগণের গলার ফাঁস হয়ে দাড়িয়েছে । এসব কার্যক্রমের ফলে মূলত লাভ হয়েছে বাস্তবায়নের সাথে জড়িতদের এবং প্রযুক্তি ও কাঁচামাল সরবরাহকারী কোম্পানিগুলোর । মোঃ আনিসুর রহমানের মতে “বিজ্ঞানের (জ্ঞানের) জগৎটি বৈজ্ঞানিকদেরই (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের) দখলে এবং ..বিভিন্ন লোকজ্ঞানের মর্যাদা এই জগতে সাধারণত অবহেলিত” (রহমান ১৯৯৩: ১৩৫) । কিন্তু, “..জনগণের উন্নয়নে তাদের লোকজ্ঞানের নিজস্ব মূল্য রয়েছে, যে মূল্য প্রচলিত উন্নয়ন বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয় নি” (রহমান ১৯৯৩: ১৩৮) । এছাড়া তার মতে, “দেশের বিদেশে শিক্ষিত ম্যানেজারিয়াল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রেণীও সাধারণত আধুনিকতম পুঁজিঘন (capital intensive) বিদেশী মেশিনাদির প্রতি বেশি আকৃষ্ট এবং দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশের দিকে তাদের তেমন আগ্রহ নেই” (রহমান ১৯৯৩: ৩৪) । এর পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, “দৈহিক পরিশ্রম ছোট কাজ, দৈহিক পরিশ্রম যে করে তাকে সমাজে নীচু চোখে দেখা হয়, তাকে মাটিতে বসতে দেওয়া হয়, তাকে ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করা হয়, তাকে কোন সরকারী অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানানো হয় না । ..দৈহিক শ্রমের এই অমর্যাদার মূলে একটি প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা । এই শিক্ষা ব্যবস্থা যারা তৈরি করেছেন তারা নিজেরা দৈহিক শ্রম করেন নি । ..এই শিক্ষাব্যবস্থা নগরমুখী, অফিসমুখী, আর যারা একটু বেশি মেধাবী তাদের জন্য বিদেশমুখী । ..এই শিক্ষা ব্যবস্থায় দৈহিক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা নেই” (রহমান ১৯৯৩: ৪১-৪২) ।

এই বাস্তবতায় আমাদের দেশে স্থানীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের চেয়ে বিদেশী জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণে বেশি আগ্রহ দেখা যায় । আর পরিবেশ সুরক্ষায় ১৮০ টি দেশের মধ্যে আমাদের ১৭৯তম অবস্থান প্রমাণ করে সামগ্রিক কর্মকান্ডে পরিবেশের সুস্থায়ীত্বের দিকে নজর দেওয়া হয় না ।[২১]

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম একেবারে উপরের দিকে । আন্তর্জাতিক জলবায়ু রাজনীতির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং চুক্তি অনুযায়ী খাতভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া “সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমালা” অর্জনে সফলতার পর বাংলাদেশ “সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমালা” অর্জনে বদ্ধপরিকর । ২০১৮ সালের মে মাসে “পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের” নাম পরিবর্তন করে “পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়” রাখা হয়, যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিকতার প্রতিফলন ।

চতুর্থ অধ্যায়

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পরিবেশ দূষণ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, অর্থাৎ ১৯৪০ এর দশকের শেষ ভাগ থেকে, পশ্চিমা দেশগুলো (আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ) এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোকে 'অনুন্নত' আখ্যা দিয়ে তাদের 'উন্নয়নের' দায়িত্ব নেয়। স্থানীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, উৎপাদন পদ্ধতি, প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করে বিশ্বব্যাপী একই রকম 'উন্নয়ন' কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। পরবর্তিতে ঐসব 'উন্নত' দেশের পরামর্শ মোতাবেক 'অনুন্নত' দেশগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে 'পশ্চিমা জীবনধারা' বা 'আমেরিকান লাইফস্টাইল' অর্জনে মনোযোগী হয়। সতেরশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু হওয়া শিল্প বিপ্লবকে পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিমা দেশগুলো প্রয়োজনীয় পুঁজি, প্রযুক্তি, কাঁচামাল ও বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করে। পরবর্তিতে 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি'-র মাধ্যমে পুরো বিশ্ব একটা গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়। এই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভাবনীয় গতি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসার ঘটছে।

সময়ের পরিক্রমায় এই পুঁজি-শিল্প-প্রযুক্তি ও নগরায়ন নির্ভর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনায় ২০১৮ সালে এসে পৃথিবীর মোট ঋণের পরিমাণ হয়েছে ১৬৪ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার, যা পৃথিবীর মোট জিডিপির ২২৫ ভাগ (এক ট্রিলিয়ন = এক লাখ কোটি)।[২২] এর মধ্যে শুধু আমেরিকা ও চীনের ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৭৩.৬ ট্রিলিয়ন ডলার, যা পৃথিবীর মোট ঋণের প্রায় ৪৫ ভাগ। অর্থাৎ যারা আমাদের ঋণ দেয় তারাই সবচেয়ে বেশি ঋণী। অন্যদিকে ২০১৮ সালে প্রকাশিত অক্সফামের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ ভাগ ধনী মানুষ বিগত ১ বছরে উৎপাদিত মোট সম্পদের ৮২ ভাগ পকেটস্থ করেছে।[২৩] তাদের হিসাব মতে, বাংলাদেশের একজন গার্মেন্টস কর্মী সারা জীবনে যা আয় করে, তা পৃথিবীর দামী ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মাত্র ৪ দিনের আয়ের সমান। এছাড়া ২০১০ সাল থেকে সাধারণ কর্মীদের চেয়ে বিলিয়নারদের আয় ৬ গুণ বেশি হারে বেড়েছে (এক বিলিয়ন = একশ কোটি)। আবার এই বিলিওনারদের ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই পুরুষ। এভাবে চলতে থাকলে, মাত্র ১ ভাগ অতি ধনী মানুষ ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশের মালিক হয়ে যাবে।[২৪]

বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিকস্ (বিবিএস) প্রকাশিত 'খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬' অনুযায়ী আমাদের দেশের সবচেয়ে ধনবান, যারা মোট পরিবারের মাত্র ৫ ভাগ, তাদের হাতে মোট আয়ের ২৮ ভাগ আছে। আর সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারের আয় মোট আয়ের মাত্র ০.২৩ ভাগ।[২৫] 'ওয়েলথ এক্স'-এর ২০১৮ সালের গবেষণায় দেখা যায় যে, ২০১২- ২০১৭ এই ৫ বছরে অতি ধনী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সব ধনী দেশকে পেছনে ফেলে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে।[২৬] দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সাত শতাংশ ছাড়িয়ে গেলেও, আয়বৈষম্য পরিমাপক গিনি সহগ ০.৪৮ এ পৌছে গেছে, যা ১৯৭২ সালে ছিল ০.৩২। গিনি সহগ যত বেশি হয় আয় বৈষম্য তত বেশি বোঝায়।

যাই হোক, ১৯৯২ সালে বিভিন্ন দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ও মরুকরণ নিয়ে কাজ করার জন্য একমত হলেও কার্বন নির্গমন, পরিবেশ দূষণ, জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির হার কমানো যায়নি। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড এর ২০১৪ সালের গবেষণা অনুযায়ী গত ৪০ বছরে পৃথিবীর বন্যপ্রাণীর অর্ধেক মারা পড়েছে।[২৭] আমাদের আধুনিক বিশ্ব এখন ষষ্ঠ গণবিলুপ্তির (mass extinction) সম্মুখীন, যার ফলে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী একেবারে হারিয়ে যাবে।[২৮] ১৯৯০- ২০১৫ সালের মধ্যে প্রায় ১২৯ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি হারিয়ে গেছে।[২৯] গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ এর হিসাব মতে, ২০১৭ সালে প্রতি সেকেন্ডে একটা ফুটবল মাঠের সমান বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে।[৩০] মনুষ্যসৃষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রায় ১৫ ভাগ হয় বনভূমি ধ্বংসের কারণে, আর মোট বনভূমি ধ্বংসের অর্ধেকের বেশি ঘটে প্রধানত কৃষি-ব্যবসায়ী কোম্পানি কর্তৃক সয়াবিন, পাম তেল, কাগজ এবং গবাদিপশুজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য।[৩১] ধ্বংস ও অবক্ষয়ের কারণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোর বনভূমি এখন যে পরিমাণ কার্বন শোষণ করে তার চেয়ে বেশি নির্গমন করছে, তাই এগুলোকে আর কার্বন সিঙ্ক বা শোষণকারী বলা যাচ্ছে না।[৩২]

জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে বায়ু দূষণের কারনে প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটে, যেই ইউরোপে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল সেখানে বায়ু দূষণের কারণে এখন গড়ে প্রতি দিন এক হাজার মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটছে।[৩৩] অন্যান্য ক্ষতির পাশাপাশি গবেষণায় দেখা গেছে বায়ু দূষণ মানুষের বুদ্ধিমত্তা কমিয়ে দেয়।[৩৪] যদিও বিশ্বের ৯২ ভাগ মানুষ বায়ু দূষণের নিরাপদ মাত্রা পার হয়েছে এমন জায়গায় বাস করছে।[৩৫]

চিত্র : কৃষি কাজের জন্য পরিষ্কার করে ফেলা বনভূমির একাংশ
(উৎসঃ https://imgur.com/gallery/622J52c)

চিত্র : পাম তেল উৎপাদনের জন্য কেটে ফেলা বনভূমির একাংশ
(উৎসঃ https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/03/stop-biodiversity-loss-or-we-could-face-our-own-extinction-warns-un (Photograph: Ulet Ifansasti/Greenpeace))

পানির অপর নাম জীবন, আর পৃথিবীর পানির মাত্র ২.৫ ভাগ হচ্ছে মিঠা পানি, যার অধিকাংশ হিমবাহ ও বরফ অবস্থায় আছে। বাকি ৯৭.৫ ভাগ পানি আছে সাগরে লবণাক্ত অবস্থায়। অর্থাৎ পৃথিবীর ছয়শ আশি কোটি মানুষের জন্য মোট পানির মাত্র ০.০০৭ ভাগ আছে। পানি একবার দূষিত হয়ে গেলে দূষণকারী পদার্থ আলাদা করা মুশকিল, ব্যয়বহুল এবং প্রায়ই অসম্ভব হয়ে যায়। কিন্তু কল-কারখানায় শিল্প উৎপাদনসহ বিভিন্ন কাজে মানুষ যে পানি ব্যবহার করে তার ৮০% অপরিশোধিত অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়, যেখানে মানববর্জ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ থেকে যায়।[৩৬] জাতিসংঘের আশঙ্কা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০২৫ সালের দিকে প্রায় ১৮০ কোটি মানুষ পানি সংকটে জর্জরিত এলাকায় বাস করবে এবং দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ পানি সংক্রান্ত সমস্যায় আক্রান্ত হবে।[৩৭]

আমাদের আধুনিক জীবনের অন্যতম ব্যবহার্য বস্তু হচ্ছে প্লাস্টিক। ২০১৫ সালে প্রায় ৪৪৮ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক উৎপাদন করা হয়েছিল।[৩৮] উৎপাদিত প্লাস্টিকের ৪২ ভাগ ব্যবহৃত হয় প্যাকেজিং করতে যা সাধারণত একবার ব্যবহারের পরেই ফেলে দেওয়া হয়।[৩৯] বিশ্বে প্রতি মিনিটে প্রায় ১০ লক্ষ প্লাস্টিক বোতলজাত কোমল পানীয় বিক্রি হয়।[৪০] অথচ মোট প্লাস্টিকের পাঁচ ভাগের মাত্র এক ভাগ রিসাইকেল বা পুনরায় ব্যবহার করা হয়। প্রতি বছর মানুষের ব্যবহৃত প্রায় ১০ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক সাগরে যেয়ে পড়ে।[৪১] এই বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিকের ৯০% সাগরে যায় মাত্র দশটি নদী দিয়ে।[৪২] এভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ সাগরে মাছের চেয়ে প্লাস্টিকের পরিমাণ বেশি হয়ে যেতে পারে।[৪৩] সাম্প্রতিক

সময়ে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন যে, প্রাণীকুলের সকলেই -ক্ষুদ্র প্লাংকটন থেকে বিশাল তিমি মাছ- খাবারের সাথে প্লাস্টিক কণা গ্রহণ করছে। এই প্লাস্টিক বা পলিথিন প্রাণীদেহের ভেতরে বা বাইরে আটকে যেয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মৃত্যু ঘটাচ্ছে। বছরে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টন মাছ ধরার জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সাগরে ফেলে দেওয়া হয়, যেগুলোতে আটকে যেয়ে লক্ষাধিক তিমি, ডলফিন, শিল ও কচ্ছপ মারা যায়।[৪৪] এছাড়া প্লাস্টিক থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক ছড়িয়ে যাওয়ারও প্রমাণ পাওয়া গেছে যা মাটি, পানি ও খাদ্যের সাথে মিশছে।

(উৎস: https://blueocean.net/a-must-read-planet-or-plastic-in-june-national-geographic/)

পৃথিবীর মধ্যে প্রথম দেশ হিসেবে ২০০২ সালে বাংলাদেশ আইন করে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু আমরা এখনও অহরহ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করছি। বিশেষ করে কাঁচা বাজার ফেরত সকলের হাতেই এক বা একাধিক পলিথিন ব্যাগ দেখা যায়। যার যত টাকা তার হাতে তত বেশি পলিথিন ব্যাগ। দোকানে চিপস্, বিস্কুট, চানাচুর, পাউরুটি, নুডুলস, চকলেট, আইসক্রিম, চা পাতা, আটা, সাবান, শ্যাম্পু, ডিটারজেন্ট ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস সব পলিথিনে মোড়ানো থাকে। সব কিছুই এখন ওয়ান-টাইম প্যাকেটে পাওয়া যায়। শুধু ঢাকা শহরেই প্রতিদিন প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ পলিব্যাগ ফেলে দেওয়া হয়।[৪৫] এছাড়া আমরা কোন অনুষ্ঠান বা মিটিং আয়োজন করলে ব্যবহার করি প্লাস্টিকের পানির বোতল, প্লাস্টিকের প্লেট, প্লাস্টিকের চামচ, প্লাস্টিকের কাপ, প্লাস্টিকের গ্লাস; যেগুলো অনুষ্ঠান শেষে ফেলে দেওয়া হয়। খাবার পানি, কোমল পানীয়, জুস, সস্, তেল, ঔষধ, শ্যাম্পু, কসমেটিকস্, কীটনাশক সবই পাওয়া যায় প্লাস্টিকের বোতলে। এখন বাংলাদেশে প্লাস্টিক পণ্যের বাজার মূল্য প্রায় ১০০ কোটি ইউএস ডলারের বেশি- যা জিডিপির প্রায় এক শতাংশ যোগান দেয় এবং বছরে জনপ্রতি প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৫ কেজি।[৪৬] কুলা থেকে শুরু করে আলমারি পর্যন্ত আমাদের ব্যবহার

করা প্রায় সব জিনিসই এখন প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়। এসব জিনিস ভেঙে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে আমরা ফেলে দেই। এই ফেলে দেওয়া পলিথিন ও প্লাস্টিক জমা হচ্ছে আমাদের মাটিতে ও জলাশয়গুলোতে। ভরাট হচ্ছে নিচু জায়গা আর আটকে যাচ্ছে পানি প্রবাহ। এসব প্লাস্টিক মাটির সাথে মিশতে সময় নিবে শত থেকে হাজার বছর। এছাড়া পদ্মা, মেঘনা, যমুনা নদী দিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭৩ হাজার টন প্লাস্টিকবর্জ্য সাগরে গিয়ে পড়ছে।[৪৭]

(উৎসঃ http://www.onegreenplanet.org/news/whale-filled-with-plastic-trash/)

(উৎসঃ https://www.australiangeographic.com.au/topics/science-environment/2016/04/pulling-the-plug-on-plastic/ (IMAGE CREDIT: Chris Jordan/U.S. Fish and Wildlife ServiceHeadquarters/Flickr))

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তন

কৃষি বাংলাদেশের ঐতিহ্য এবং মূল চালিকা শক্তি। হাজার হাজার বছর ধরে এ অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজ করে আসছে। দেশের কৃষক, সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কৃষিবিদ, গবেষক এবং নীতি-নির্ধারকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের চেয়ে কৃষি উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি-তে কৃষির অবদান ক্রমে কমতে থাকলেও। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মত বিষয়গুলোতে কৃষির ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা দেশগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায়, ১৯৬০ এর দশকে বিশ্বব্যাংক 'অনুন্নত' দেশগুলোতে সেচ প্রকল্প ও ফসল-বিজ্ঞান গবেষণায় সহায়তা ও ঋণ প্রদান শুরু করে। এসময় কৃষি-উন্নয়ন প্যাকেজের অংশ হিসেবে, 'হাই-ইনপুট রেসপনসিভ' বা 'উচ্চ ফলনশীল' (উফসি) জাতের বীজ, সিনথেটিক সার ও কীটনাশক কৃষকের কাছে বিক্রি করা শুরু হয়। এর মাধ্যমে উত্তরের দেশগুলো থেকে পুঁজি, দক্ষতা ও প্রযুক্তি দক্ষিণের দেশগুলোর কৃষি সেক্টরে আসা শুরু হয় এবং বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি ব্যবসা শুরু করে। অধিকাংশ উফসি বীজ উৎপাদনকারী কোম্পানিই আবার রাসায়নিক উপকরণ (সার, বালাইনাশক) উৎপাদনের সাথে জড়িত। এভাবে আমেরিকা বা ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির ব্যবসার সাথে বাংলাদেশের গ্রামের কৃষক ও ভোক্তারা যুক্ত হয়ে যায়। এসময় রকফেলার ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ইরি- IRRI) ও মেক্সিকোতে আন্তর্জাতিক গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া কৃষি গবেষণার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির এই ঘটনাকে 'সবুজ বিপ্লব' বলা হয়। ১৯৬৯ সালে আমেরিকান সরকার 'সবুজ বিপ্লবকে' বৈদেশিক নীতির অন্যতম উপাদান হিসেবে যুক্ত করে। দক্ষিণ এশিয়াতে সবুজ বিপ্লবের আওতায় ফিলিপাইন ও মেক্সিকো থেকে ধান ও ভুট্টার উফসি বীজ আমদানি করা হয়, যেগুলো চাষ করতে প্রয়োজন সেচযন্ত্র, ডিজেল, সিনথেটিক বা রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক। এসময় দক্ষিণের সরকারগুলো কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ভর্তুকি প্রদান শুরু করে। এই ভর্তুকি সরাসরি বিক্রেতা কোম্পানির একাউন্টে যোগ হত, যার ফলে কৃষকরা বাজার থেকে কম মূল্যে কৃষি উপকরণ কিনতে পারতেন।

২০০৮ সালে বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন, বিগত কয়েক দশক ধরে চলা কৃষি উন্নয়নের অগ্রগতি ও ফলাফল বোঝার জন্য একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এই IAASTD প্রতিবেদন[৪৮] অনুযায়ী বিগত কয়েক দশকে কৃষিবিজ্ঞানের মূল চিন্তা ছিল নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, যার ফলে কৃষি উৎপাদন কয়েক গুণ বেড়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র মানুষেরা, যারা এই উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও সবচেয়ে কম লাভবান হয়েছে, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর

সমাধান হয়নি। বর্তমানে পৃথিবীতে একদিকে যেমন অসম উন্নয়ন হচ্ছে, অন্যদিকে দারিদ্রতা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো থেকেই যাচ্ছে। এই প্রতিবেদনে স্থানীয় ইকোসিস্টেম ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রেখে সেই অনুযায়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন এবং পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ও সুস্থায়ীত্বের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়।

জাতিসংঘের ২০১৮ সালের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক বৈশ্বিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২০১৭ সালে পৃথিবীর ৮২ কোটির বেশি মানুষ -প্রতি ৯ জনে ১ জন- অপুষ্টিতে ভুগছিল, যা ২০১৬ সালের চেয়ে বেশি। বিশ্বব্যাপি অপুষ্টি ও ক্ষুধা (hunger) বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের ধরনে ও কৃষি মৌসুমের পরিবর্তন, খরা ও বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি, যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক মন্দা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ধান, গম ও ভূট্টার উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে এবং তাপমাত্রার চরম উঠানামার কারণে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।[৪৯]

২০১৮ সালের বৈশ্বিক খাদ্য সংকট প্রতিবেদনে[৫০] দেখা যায়, ২০১৭ সালে নাইজেরিয়া, নাইজার, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, সুদান, ইয়েমেন ও দক্ষিণ সুদানে প্রধান খাদ্যশস্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে গেছে। বন্যার কারণে ধান উৎপাদন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাতে চালের দাম অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

যাই হোক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ২০১০ সালের হেগ শহরে জাতিসংঘের খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলনে “ক্লাইমেট স্মাট এগ্রিকালচার (সিএসএ)” বা জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির ধারণা শুরু হয়। এর লক্ষ্য মূলত কৃষির উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি এবং যতটা সম্ভব গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমানো। সিএসএ বা জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি কিছু প্রযুক্তি ও চর্চার সমষ্টি। তবে অনেক গবেষক আশঙ্কা করেছেন যে এসব প্রযুক্তির সবগুলোই কৃষক ও পরিবেশের জন্য উপকারী হবে না। বরং কিছু প্রযুক্তির প্রসারের ফলে মূলত লাভবান হবে কৃষি উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। যারা সিএসএ’র বিরোধিতা করছেন তারা এর লক্ষ্যসমূহকে সাধুবাদ জানালেও, কি কি প্রযুক্তির মাধ্যমে ঐসব লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করা হবে সেগুলো নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন।[৫১] জলবায়ুর নামে কার্যক্রম বাস্তবায়নে বা প্রযুক্তি নির্ধারণে সবার আগে কৃষক ও পরিবেশের সুস্থায়ীত্বের দিকে নজর দেওয়ার উপর তারা গুরুত্বারোপ করছেন। এর জন্য কৃষক পর্যায়ে প্রযুক্তি প্রচারের আগে যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব পরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি।

ষষ্ঠ অধ্যায়
করণীয়: ভবিষ্যত কৃষি ও জীবন

এখন আমরা 'উন্নয়ন' বলতে সাধারণত যা বুঝি তা এসেছে মূলত পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর এবং শিল্পায়ন ও নগরায়নের মাত্রা দিয়ে পরিমাপ করা হয়। আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের চূড়ান্ত উন্নতি বলতে মনে করা হয় পশ্চিমা দেশের মানুষের মত জীবন যাপন করা। অথচ পশ্চিমা মডেলের অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থায় আমাদের পৃথিবীর সামাজিক ও পরিবেশগত কি বিশাল ক্ষতি হয়েছে তা আজ স্পষ্ট। তাই আমাদের পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে আর দেরি করার উপায় নেই। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু নিয়ে কূটনৈতিক আলোচনা বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, পরিবর্তিত জলবায়ুতে টিকে থাকার জন্য এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য আমাদের জাতীয়, স্থানীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুস্থায়ী উদ্যোগ নিতে হবে। নিচে আমাদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হল।

কৃষি বাংলাদেশের ঐতিহ্য এবং মূল চালিকা শক্তি। আমাদের কৃষি ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব তথা বিভিন্ন দূর্যোগ বা বালাই এর সাথে মোকাবেলা করতে পারে, প্রতিবেশবান্ধব ও সমতাভিত্তিক হয় এবং কৃষকের স্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য গুরুত্ব পায়। এরকম সুস্থায়ী কৃষি সম্ভব দুইভাবে:

ক. ইকোলোজিকাল রেজিলেন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে;

খ. স্থানীয় কমিউনিটি বা সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে।

ইকোলোজিকাল রেজিলেন্স বৃদ্ধি: কোন কৃষি খামারের ইকোসিস্টেমে যদি বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় উদ্ভিদ (শস্য ও অশস্য) ও প্রাণী থাকে তাহলে সেই ইকোসিস্টেম অনেক জটিল বা ঘাতসহ হয়ে যায়। তখন ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত উদ্ভিদ ও প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে নানান রকম সম্পর্ক গড়ে তোলে। ইকোসিস্টেম জটিল থাকার কারণে এরকম খামারে বিভিন্ন ধরণের দূর্যোগ বা বালাই (শত্রু পোকা, রোগ-জীবাণুবাহী ভাইরাস, কৃমি প্রভৃতি) তুলনামূলক কম আক্রান্ত করতে পারে, বা আক্রান্ত হলেও ঐ ইকোসিস্টেম দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। এই ক্ষমতাকে ইকোলজি বা প্রতিবেশের রেজিলেন্স বলে। কৃষি খামারের ইকোসিস্টেম জটিল করার কয়েকটি পদ্ধতি হচ্ছে (দেব : ২০১৭):

- খামারে মাটির চরিত্র ও জলবায়ুর উপযোগী স্থানীয় বিভিন্ন প্রজাতির শস্য চাষ করা
- এক প্রজাতির শস্যের কয়েক ধরনের বা যত বেশি সম্ভব জাত চাষ করা
- বিভিন্ন ধরণের অশস্য বা সঙ্গী উদ্ভিদের বৈচিত্র্য বাড়ানো
- খামারে বিভিন্ন উচ্চতার গাছ রাখা (বৃক্ষ, বিরুৎ, গুল্ম, ঝোপ প্রভৃতি)

- বিভিন্ন ধররের শস্য, অশস্য ও ভিন্ন উচ্চতার গাছ থাকলে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সময়ে নানান ধরনের প্রাণী (পাখি, পোকা, ব্যাঙ, সরিসৃপ প্রভৃতি) আসে। এই প্রাণীবৈচিত্র্যকে যথাসম্ভব লালন করা
- মাটির নিচের স্থানীয় জীবাণু বা অনুজীব বৈচিত্র্য বাড়ানো
- খামারে জলাশয় বা ক্ষেতে ছোট ছোট গর্ত রাখা, যাতে সেখানে পানি জমে নানান রকম জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকতে পারে
- সর্বোপরি অশস্য সঙ্গী উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবদের ব্যবহার করে কৃষি কাজ করা। এজন্য স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ও জীববৈচিত্র্যের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো বিষদভাবে জানা জরুরি
- মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনে স্থানীয় জৈব সার তৈরি ও ব্যবহার করা এবং মালচিং করা
- প্রয়োজনে স্থানীয় উপাদান দিয়ে জৈব বালাইনাশক তৈরি ও ব্যবহার করা।

এভাবে জীববৈচিত্র্য বাড়িয়ে কৃষি-ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে সুস্থায়ী কৃষি চর্চা করলে খামারের উৎপাদনশীলতা বজায় থাকে। কারণ শস্যের বন্ধু প্রাণীগুলো যেমন শত্রু প্রাণীগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, আবার বিভিন্ন অ-শস্য সঙ্গী উদ্ভিদ মাটিতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে, শত্রু পোকাকে দূরে রাখে, রোগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাড়তি সঙ্গী উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদনশীলতা মানে শুধু নির্দিষ্ট শস্যের উৎপাদন বা ফলন নয়, এর সাথে খামারের উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবের সংখ্যা, মাটির স্বাস্থ্য, পরিবেশ প্রভৃতিও হিসাবের মধ্যে রাখা উচিৎ। খামারে বাইরের কোন কিছু প্রয়োগ করতে হলে খেয়াল রাখতে হবে যাতে:

- খামারের সকল প্রাকৃতিক চক্রসমূহ বজায় থাকে (পানি চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, কার্বন চক্র প্রভৃতি)
- উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো বজায় থাকে
- খামারের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বজায় থাকে।

এছাড়া যেসব কৃষি-উপকরণ তৈরি, পরিবহন ও প্রয়োগ করতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হয়, পরিবেশ দূষিত হয় ও জীববৈচিত্র্য মারা যায়, সেসব বাদ দেওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে টিকে থাকার জন্য প্রথম কাজ হওয়া উচিৎ। এজন্য স্থানীয় মাটি, পানি, পরিবেশ, জলবায়ু ও সংস্কৃতি উপযোগী এবং খামারের বাইরের উপকরণ ছাড়াই চাষ করা যায় এমন শস্যের জাত ও প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ, উদ্ভাবন, সংরক্ষণ ও প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করার বিকল্প নেই।

স্থানীয় কমিউনিটি বা সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করা: গ্রামে দেখা যায় অনেক কৃষকই নিজের পরিবারের জন্য আলাদাভাবে চাষ করেন, যেখানে বালাইনাশক বিষ বা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় না। অন্যদিকে বাজারে বিক্রির জন্য যেখানে চাষ করেন সেখানে দোকান থেকে কিনে এনে রাসায়নিক সার ও বিভিন্ন ধরণের বালাইনাশক বিষ প্রয়োগ করেন, যাতে ফসলে পোকার কাটা বা কোন দাগ না থাকে এবং দেখতে সুন্দর ও বড় হয়। এর কারণ হচ্ছে কৃষক নিজের পরিবারের সদস্যদের রাসায়নিক বা বিষমুক্ত নিরাপদ ফসল খাওয়াতে চান। কিন্তু বাজারে পোকার দাগওয়ালা বা ছোট বা দেখতে অসুন্দর ফসল নিয়ে গেলে ভোক্তারা কিনতে চান না। অর্থাৎ কৃষক এবং অ-কৃষক বা ভোক্তা বা অন্য পেশাজীবিদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতা কাজ করে। কৃষক জানেন যে বিষ প্রয়োগ করা ফসল নিরাপদ নয়, তাও তিনি বাধ্য হন চাষ করতে অ-কৃষকদের অসচেতনতার কারণে। আবার ক্রমাগত রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে যে মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে বা বিষ প্রয়োগের ফলে জীববৈচিত্র্য মারা যায়, সে ব্যাপারেও অ-কৃষকরা

অসেচতন। এমনকি তারা জানেন না যে কোন্ ফসল ফলাতে কৃষকের কত খরচ হয় বা কখন কোন ফসলের স্বাভাবিক মৌসুম। কৃষকদের কৃষিকাজের জন্য খামারের বাইরে যেসব উদ্ভিদ বা প্রাণী থাকা প্রয়োজন, সেগুলো রক্ষা বা লালনে তাদের কি ভূমিকা তাও অ-কৃষকদের অনেকেই জানেন না। কৃষি-প্রতিবেশ এলাকা অনুযায়ী স্থানীয় শস্যের নাম, পুষ্টি বা ঔষধিগুণও বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই জানেন না। স্থানীয় খাদ্যাভাস ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। মানুষের উৎপাদিত ফসল শুধু মানুষেরই কাজে লাগে না, বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে প্রকৃতিতে থাকা অনেক প্রাণীও এগুলোর উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় প্রয়োজনীয় খাদ্য বাইরে থেকে নিয়ে আসায় একদিকে যেমন খাদ্য পরিবহনে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হয়, অন্যদিকে প্যাকেজিং এর জন্য সম্পদ অপচয় ও প্রচুর অপচনশীল আবর্জনা সৃষ্টি হয়। আবার গ্রাম থেকে শহরে যে বিপুল পরিমাণ কাঁচা শাক-সবজি, ফল-মূল ইত্যাদি আসে, তার অবশিষ্টাংশ আর গ্রামের মাটিতে ফিরে যায় না। ফলে মাটি বঞ্চিত হচ্ছে জৈব উপাদান থেকে। সব মিলিয়ে কৃষিকাজ আর কৃষকের জন্য লাভজনক থাকছে না, তারা সমাজে সম্মান পাচ্ছেন না, রাসায়নিক উপাদান প্রয়োগের ফলে জীববৈচিত্র্য মারা যাচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং মাটির উর্বরতা শক্তি ও জৈব উপাদান কমে যাচ্ছে। এর থেকে পরিত্রানের জন্য বিভিন্ন পেশাজীবিদের মধ্যে (কৃষক ও অন্যান্য অকৃষি পেশার মানুষ) পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। এক পেশার মানুষ যেন অন্য পেশার মানুষের উপর ভরসা করতে পারেন সেই পরিস্থিতি তৈরি ছাড়া মানব সমাজের টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। কৃষক যেমন সমাজের সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, তেমনি সমাজ বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব কৃষকের পরিবারের স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এটা কৃষকসহ সকলেরই সাংবিধানিক অধিকার। বীজ, জমি, পানি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কৃষকের অধিকার ও দায়িত্ববোধ নিশ্চিত করাও জরুরি। সর্বোপরি সমাজের সকলের মধ্যে স্থানীয় সংস্কৃতি, পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করতে হবে। স্থানীয় ইকোসিস্টেমকে জানা, বোঝা, পুনরুদ্ধার ও টিকিয়ে রাখা ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে টিকে থাকার বা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়ার জন্য আর বিকল্প নেই।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ ধ্বংস মোকাবেলায় কৃষক ছাড়াও অন্য শ্রেণি ও পেশার মানুষের কার্যক্রমও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কারখানা বা অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে দূষিত পদার্থ নির্গমন বন্ধ না হলে পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব নয়। এছাড়া আমরা যখন বাড়ি, রাস্তা, অবকাঠামো প্রভৃতি তৈরি করি বা বিভিন্ন 'উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হয় তখন পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো সবার আগে বিবেচনায় নেওয়া দরকার। স্থানীয় পরিবেশবান্ধব জ্ঞান, দক্ষতা ও উপাদান ব্যবহার করা ছাড়া গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বা পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব নয়।

আগে যেমন শক্তিশালী দেশসমূহ আমাদের উপর বিভিন্ন প্রযুক্তি চাপিয়ে দিয়েছিল, এখনও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের নামে নতুন নতুন প্রযুক্তি আমাদের দেশে আসছে। এসব প্রযুক্তি আসলেই দীর্ঘমেয়াদে আমাদের উপযোগী কিনা বা পরবর্তিতে নতুন কোন বিপদ ডেকে আনবে কিনা, তা প্রযুক্তি গ্রহণ করার আগেই সততার সাথে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ভাল বা মন্দ দিক বিস্তারিত অবহিত করে, যাদের জন্য প্রযুক্তি সেই জনগোষ্ঠীর মতামত নিতে হবে। এখন যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলোও সুস্থায়ী কিনা তাও গবেষণার আওতায় আনা প্রয়োজন। পরিবেশ ও জলবায়ুর কথা

বিবেচনা না করে শুধু অর্থনৈতিক লাভ ও শারীরিক আরামের জন্য যদি মানুষ কাজ করে তাহলে তার সামাজিক ও পরিবেশগত ফলাফল কতটা ভয়াবহ হয় তা সকলের কাছে স্পষ্ট। এখান থেকে শিক্ষা না নিতে পারলে আমাদের পৃথিবী আরও দ্রুত বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে।

আমরা বিশুদ্ধ মাটি, পানি, বাতাস ছাড়া স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারব না। আর আমাদের মাটি, পানি, বাতাস যদি সম্পূর্ণ দূষিত হয়ে যায় তাহলে কাদের লাভ হবে সেটা বোঝাটা জরুরি। পানির দেশ বাংলাদেশে ইতোমধ্যে মানুষ বোতলজাত পানি কিনে পান করতে বাধ্য হচ্ছে। বিদেশের বাজারে বিশুদ্ধ বাতাস বিক্রির খবরও শোনা যাচ্ছে। যেসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি পানি আর বাতাস দূষিত করছে তাদের মধ্যেই কেউ কেউ আবার সেগুলো বোতলজাত করে বিক্রি করছে। যেই কোম্পানির পণ্যের কারণে পানিতে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত হচ্ছে তারাই আবার পানি বিশুদ্ধ করার ফিল্টার বিক্রি করছে। ব্যবসার স্বার্থে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ অবাধে আহরণ, দূষিত ও ধ্বংস করে সেখান থেকে অন্য ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে। বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষের দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পৃথিবীটাকে আরও ভাল অবস্থায় রেখে যাওয়া। অথচ এই পৃথিবী ধ্বংস করে মঙ্গল গ্রহে গিয়ে বাস করার জন্য কোটি কোটি ডলারের গবেষণা চলছে। মঙ্গল গ্রহে কি পৃথিবীর সকল মানুষের স্থান হবে? নাকি ব্যবসায়িক স্বার্থে পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে ফেলে লাভবান হওয়া গুটিকয়েক মানুষ সেখানে যেতে পারবে? বাকি মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর কি হবে? যারা পৃথিবী নামক সুন্দর গ্রহেই টিকতে পারল না তারা কি মঙ্গল গ্রহে টিকে থাকতে পারবে? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। যেসব শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে জলবায়ু পরিবর্তনকে অস্বীকার করে এসেছে, আমাদের বাসস্থান পৃথিবীর যে ক্ষতি তারা করেছে তার দায়ভার ও ক্ষতিপূরণ এড়ানোর জন্য নানান টালবাহানা করছে এবং জলবায়ু ন্যায্যতা ও সমতাকে অস্বীকার করে প্রবৃদ্ধির নামে এখনও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, আমাদের রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকরা তাদের পক্ষ নিবেন নাকি একটি আন্ত:প্রজন্ম সমতাভিত্তিক বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার জন্য কাজ করবেন তা জনগণেরই ঠিক করতে হবে। পাশাপাশি মন ভুলানো বিজ্ঞাপন, মনোমুগ্ধকর মোড়ক ও চোখ ধাঁধানো বাজারের মাধ্যমে তৈরি হওয়া বর্তমান ভোগবাদী মানসিকতা পরিবর্তন করে একান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ, শক্তি ও বস্তু ব্যবহার বন্ধ করা জরুরি।

আইনী বাধা থাকা সত্বেও মানুষের পরিবেশ ধ্বংসকারী আচরণ তখনই অব্যাহত থাকে যখন সেটি লাভজনক হয় ও সমাজের অনুমোদন পায়। যেমন পলিথিন ব্যাগের নির্বিচার ব্যবহার হচ্ছে, যদিও পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু একজনের ফেলে দেওয়া পলিথিন ব্যাগ বা একটা কারখানা নির্গত হওয়া দূষিত পদার্থ সমাজের সকলকেই আক্রান্ত করে। সমাজের মেনে নেওয়া বা না মেনে নেওয়ার উপর মানুষের ব্যক্তিগত আচরণ অনেকটাই নির্ভর করে। তাই পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বিধি-নিষেধ তৈরি করা ছাড়া পরিবেশ ধ্বংস থামানো বা পরিবর্তিত জলবায়ুতে টিকে থাকা কঠিন। আর এই সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সচেতনতা সৃষ্টি হতে পারে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার স্থাপনের মাধ্যমে। অর্থাৎ নিজেদের এলাকার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও লালনের দায়িত্ব কমিউনিটির মানুষদেরই নিতে হবে। শক্তিশালী স্থানীয় গণতান্ত্রিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে এভাবে সুস্থায়ী সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরী, যেখানে ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সমষ্টির স্বার্থ প্রাধান্য পাবে এবং সাময়িক লাভের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী লাভ অগ্রাধিকার পাবে।

তথ্যসূত্র

১. https://www.businessinsider.com/mercator-projection-v-gall-peters-projection-2013-12

২. https://www.theguardian.com/education/2017/mar/19/boston-public-schools-world-map-mercator-peters-projection

৩. http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6_%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE

৪. https://www.washingtonpost.com/energy-environment/2018/12/05/we-are-trouble-global-carbon-emissions-reached-new-record-high/?fbclid=IwAR0TTkfCra4LCM6aGOfmZPQ3sQvISEFqDQQ0yf2Vp8ahHfEgaE2Hvxxyklc&noredirect=on&utm_term=.907d388f0ed9

৫. https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/28/the-world-passes-400ppm-carbon-dioxide-threshold-permanently

৬. https://siberiantimes.com/ecology/casestudy/news/n0681-now-the-proof-permafrost-bubbles-are-leaking-methane-200-times-above-the-norm/

https://insideclimatenews.org/news/27022017/global-warming-permafrost-study-melt-canada-siberia

৭. http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/

৮. https://www.facebook.com/unitednations/posts/10155493275340820

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/889172/?utm_source=facebook&utm_medium= social+media&utm_campaign=fao+facebook

৯. http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/FWF_and_climate_change.pdf (page 1)

১০. https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change

১১. https://www.washingtonpost.com/energy-environment/2018/12/05/we-are-trouble-global-carbon-emissions-reached-new-record-high/?fbclid=IwAR0TTkfCra4LCM6aGOfmZPQ3sQvISEFqDQQ0yf2Vp8ahHfEgaE2Hvxxyklc&noredirect=on&utm_term=.907d388f0ed9

১২. https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/07/The-Climate-Deception-Dossiers.pdf

১৩. https://www.scientificamerican.com/article/exxon-knew-about-climate-change-almost-40-years-ago/

https://insideclimatenews.org/content/Exxon-The-Road-Not-Taken

১৪. https://www.pulitzer.org/finalists/insideclimate-news

১৫. https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/07/The-Climate-Deception-Dossiers.pdf

১৬. http://brri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brri.portal.gov.bd/page/de67726d_689e_ 4b72_b8c4_89c90635842f/Factsheet9-BRRI%20dhan29_.pdf (01/12/2018)

১৭. http://fpmu.gov.bd/agridrupal/content/screening-nutritionally-rich-and-low-glycemic-index-bangladeshi-rice-varieties

http://www.academicjournals.org/app/webroot/article/article1380728819_Fatema%20et%20al.pdf

১৮. https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/glycemic-index-and-glycemic-load-for-100-foods

১৯. https://www.thedailystar.net/city/wait-almost-over-beta-carotene-rich-golden-rice-release-in-bangladesh-1531684

২০. Khan, A. A. 2010. Friendly Fires, Humpty Dumpty Disorders, and other Essays. UPL. Dhaka (9-10)

২১. https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline

২২. https://www.weforum.org/agenda/2018/09/sleepwalking-towards-the-next-financial-crisis-here-are-the-five-biggest-risks

২৩. https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-22/richest-1-percent-bagged-82-percent-wealth-created-last-year

২৪. https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030

২৫. http://samakal.com/economics/article/17101088/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0

২৬. https://www.prothomalo.com/opinion/article/1558024/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE

২৭. https://www.theguardian.com/environment/2014/sep/29/earth-lost-50-wildlife-in-40-years-wwf

২৮. https://www.theguardian.com/environment/2015/jun/19/humans-creating-sixth-great-extinction-of-animal-species-say-scientists

২৯. http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/faqs/whats-redd-and-will-it-help-tackle-climate-change/

৩০. https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2018/jun/27/one-football-pitch-of-forest-lost-every-second-in-2017-data-reveals

৩১. https://www.weforum.org/agenda/2018/09/the-deforestation-risks-lurking-in-the-banking-sector

৩২. http://science.sciencemag.org/content/early/2017/09/27/science.aam5962

৩৩. https://www.weforum.org/agenda/2018/09/europe-s-dirty-air-kills-400-000-people-every-year

৩৪. https://www.weforum.org/agenda/2018/08/air-pollution-is-damaging-your-brain-concludes-new-study

৩৫. https://www.weforum.org/agenda/2016/10/air-pollution-the-true-cost-in- numbers

. https://www.unenvironment.org/explore-topics/water/what-we-do/tackling-global-water-pollution

৩৭. https://www.nationalgeographic.com/environment/freshwater/freshwater- crisis/

৩৮. https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/06/plastic-planet-waste-pollution-trash-crisis/

৩৯. https://ourworldindata.org/plastic-pollution

৪০. https://news.nationalgeographic.com/2018/05/plastics-facts-infographics-ocean-pollution/

৪১. https://www.independent.co.uk/environment/turtles-plastic-pollution-deaths-australia-microplastic-waste-a8536041.html

৪২. https://www.weforum.org/agenda/2018/06/90-of-plastic-polluting-our-oceans-comes-from-just-10-rivers/

৪৩. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics-catalysing-action

৪৪. https://www.worldanimalprotection.org.uk/campaigns/animals-wild/sea- change

৪৫. https://www.thedailystar.net/opinion/environment/beat-plastic-pollution- 1586287

৪৬. http://www.theindependentbd.com/printversion/details/147312

৪৭. https://en.prothomalo.com/environment/news/177094/73-thousand-tonnes-of-plastic-waste-enters-the-sea

৪৮. https://www.greenfacts.org/en/agriculture-iaastd/

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Assessment_of_Agricultural_Knowledge,_Science_and_Technology_for_Development

৪৯. https://edition.cnn.com/2018/09/11/health/un-hunger-report-2018-intl/index.html?utm_term=link&utm_source=fbCNN&utm_medium=social&utm_content=2018-09-16T06%3A30%3A07

http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf

৫০. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000069227/download/?_ga=2.150246133. 251098977.1537673677-2128292708.1537673677

৫১. https://focusweb.org/system/files/climate_smart_or_corporate_smart_agriculture_-_english.pdf

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড. ২০১৭. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (নবম-দশম শ্রেণি). ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড. ২০১৭. ভূগোল ও পরিবেশ (নবম-দশম শ্রেণি). ঢাকা

সরকার, চিত্তরঞ্জন. ২০১২. জলবায়ু পরিবর্তন ও নারীর উপর প্রভাব. ঢাকা: স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট

দেব, দেবল. সুরাইয়া বেগম, নিলুফার হাই করিম, মোহাম্মদ জহিরউল্লাহ, এবং মোঃ ইফতেখার.আলী. ২০১৭. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল. ঢাকা: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)

রহমান, মোঃ আনিসুর. ১৯৯৩. অপহৃত বাংলাদেশ. ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

রহমান, মোঃ সাইদুর. সুরাইয়া বেগম এবং মোঃ ইফতেখার.আলী. ২০১৭. বাণিজ্যিকিকরণ এবং ভ্রান্ত সমাধান: জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি এবং বিকল্পসমূহ. ঢাকা: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)

বেগম, সুরাইয়া. এবং মোঃ ইফতেখার.আলী. ২০১৪. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি ব্যবহার ও কৃষির কৌশলপত্র. ঢাকা: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)

মুহাম্মদ, আনু. ২০০৯. বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভব?. ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

Brammer, Hugh. 2002. Land Use and Land Use Policy in Bangladesh. Dhaka: The University Press Limited

Brammer, Hugh. 1996. The Geography of the Soils of Bangladesh. Dhaka: University Press Limited

Deb, Debal. 2009. Beyond Developmentality: Constructing Inclusive Freedom and Sustainability. Delhi: Daanish Books

Dutta, Soumya, Soumitra Ghosh, Shankar Gopalkrshnan, C.R. Bijoy, and Hadida Yasmin. 2013. Climate Change And India: Analysis of Political Economy and Impact. Delhi: Rosa Luxemburg Stiftung- South Asia

Guhathakurta, Meghna. 2015. Agrarian Change in Bangladesh and its Implications for the Marginal Farmers Issues, Debates, Challenges. Dhaka: Research Initiatives, Bangladesh.

Khan, Akbar Ali. 2010. Humpty Dumpty Disorders, and other Essays. Dhaka: University Press Limited

Rahman, A Atiq, M. E. Hurtado,. Kelly Haggart, Rose Gregory, Youba Sokona, S. Huq, E. Haq, and D. Mallick, (eds.). Environment and Poverty: Key linkages for Global Sustainable Development. 1998. Dhaka: The University Press Limited

Schumacher, J. 2018. Climate Damage- The World Is Drowning And No One Wants To Pay. Analysen No. 30. 2nd revised edition. Berlin: Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Shamsuddoha, Md., Iqbal, S. M. Saify, Alokananda Datta, and Muhammad Mizanur Rahman. 2018. Troubled Journey Towards Climate Justice- Tackling manifest climate injustice in the Loss and Damage negotiations. Dhaka: Centre for Participatory Research & Development

Thapa, Parul Laxmi. 2015. Climate Change and The Agriculture Crisis: Agroecology as a Solution. Delhi: Focus on the Global South

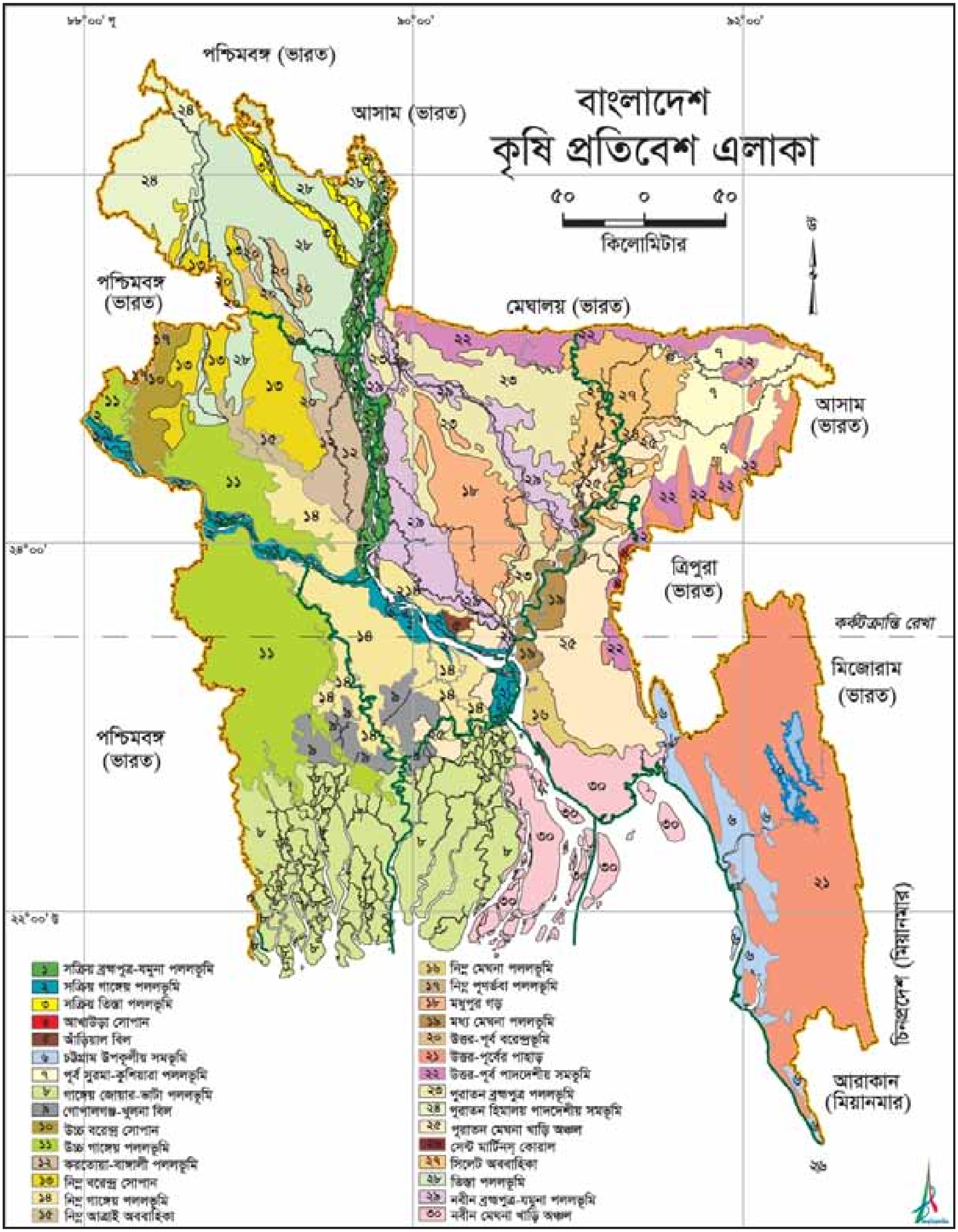

ম্যাপ: বাংলাদেশের কৃষি-প্রতিবেশ এলাকা

উৎস: http://bn.banglapedia.org/images/8/84/Agroecology.jpg

Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research (*Gonogobeshona*) on the development schemes that affects them most, in order to develop ownership and generate community mobilization.

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material.

For more information please visit : www.rosalux.in